অস্তিত্বের কোনও লক্ষণই সেদিন তার মধ্যে দেখা যায়নি।

সেই আদিম যুগের বনের মানুষের যে মনোভাব ছিল আজ নগরের সুসভ্য মানুষেরও সেই মনোভাব তেমনি রয়ে গেছে। সেই সৃষ্টির অগ্নিময় আবেগ, সৃজন করবার তেমনি ফেনিল উন্মত্ততা। পুরুষ স্রষ্টা, তাই অকরুণ, নিষ্ঠুর, রুদ্র আগুনের দেবতা সে। নারীর সত্য স্বরূপের মহিমা আজও তার তেমনি অজ্ঞাত। নারী যে জননী, সৃষ্টি যে তার মধ্যে সংহতি পায়; নারী যে ধাত্রী, সৃষ্টিকে যে সে প্রলয়ের উন্মত্ততা থেকে রক্ষা করতে পারে; করুণ, কোমল, পেলব সুধা-নির্ঝর সিঞ্চনে আগুনকে যে সে সীমার মধ্যে ধরে রাখতে জানে; সীমার দেবী সুধার দেবী যে নারী একথা সে আজও ভাল করে বোঝে না।

সেই দৈহিক শক্তির তারতম্য যেটা কার্য্যের প্রকৃতি ভেদে অবশ্যম্ভাবী ছিল সেই তারতম্যই সেদিন নারীর লাঞ্ছনা অবমাননার কারণ হয়েছিল, আর আজও সেটা তেমনি অবমাননার কারণ রয়ে গেছে।

যে কোন বস্তুকে পুরুষ দৈহিক শক্তির দ্বারা স্ববশে আনতে পেরেছে তাকেই সে আপনার ভোগের সামগ্রী করে তুলেছে। প্রথমে নারীকেও সে বাদ দেয় নি। যে দিন আকস্মিক কোন ঘটনায় পুরুষ নারীর শক্তির স্বল্পতার সম্বন্ধে চেতন হল সেই দিন থেকে সে পুরুষের ভোগের সামগ্রীতে পরিণত হল। তাকে হরণ করে আনবার জন্যে, আত্মভোগের জন্যে তাকে রক্ষা করবার জন্যে রক্তের স্রোত বইল।

দৈহিক শক্তি যে যুগে শক্তির একমাত্র নিদর্শন ছিল ইতিহাসের সেই প্রাচীন যুগে পুরুষ তার সব কাজে দৈহিক শক্তির নিদর্শন দেখিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করত। শক্তির এই ধরণের অভিব্যক্তি সে যুগের লোকের পক্ষে যে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তারা জয় করত যেমন দৈহিক শক্তি দিয়ে, তারা নারীকে ভালবাসা নিবেদন করত তেমনি দৈহিক শক্তি দিয়ে। তাদের নারীকে অনুরাগ জানাবার উপায় ছিল নারীকে আঘাত করে, অচেতন করে দিয়ে। শক্তি বলতে তারা যা বুঝেছিল আর শক্তি বলতে তারা যেটুকু পেয়েছিল তাতে সেই শক্তির পরিপূর্ণ বিকশের ঐ একমাত্র পথই তাদের কাছে খোলা ছিল। সেদিন পুরুষ যে শক্তি পেয়েছিল তার বিকাশ ঘটেছিল সর্ব্বত্রই দৈহিক শক্তিতে অক্ষম যে তাকে পরাভূত করে, বশীভূত করে।

কিন্তু বরাবর এম্‌নি চলল না। কালে নারীর কথা একটু স্বতন্ত্র হোয়ে দাঁড়াল। পুরুষের অন্যান্য ভোগ্যবস্তুর সঙ্গে নারীকে ঠিক এক পর্য্যায়ভুক্ত করে দেখা আর সম্ভব হল না। পুরুষ এবং নারীর পরস্পরের মধ্যে সঙ্গলিপ্সা থাকার দরুণই এমনটি ঘটল।

সেই নারীকে দৈহিক শক্তি দিয়ে জয় করে আনলেও পুরুষ যে দিন নারীর এই পুরুষের সঙ্গলিপ্সা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সচেতন হল সেদিন থেকে সে দৈহিক শক্তিকে অনেক কিছু আবরণের তলায় সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করলে। যত দিন যায় পুরুষ আবরণের পর আবরণ দিয়ে তার পশুকে ঢাকতে চায়। কিন্তু পশুকে মারতে হবে যেখানে সেখানে পশুকে শুধু ঢাকতে গেলে চলবে কেন? ফলে হোল পুরুষ আবরণের ভারে আপনিই ক্লান্ত হোয়ে পড়ল। চল-চপল পথিক পুরুষ—তার এত আবরণ সইবে কেন? তাই চারিদিক থেকে পথিকের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, ধ্বংস কর, বিনাশ কর, পাপকে আবৃত্ত করে রেখ না।

অন্তরের শক্তিতে নয়, শুধু দেহের শক্তি দিয়ে যে দিন পুরুষ নারীকে হরণ করে এনেছিল সে দিন থেকে নারীকে সে যে ভোগ্যবস্তু বানিয়েছে তার জের আমাদের এখনো টেনে বেড়াতে হচ্ছে। প্রেমের যে বস্তু সে বহু থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা দেয় প্রেমিকের কাছে। সে তখন তার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন থেকে বেরিয়ে আসে। সীমার দ্বারা সে খণ্ডিত নয়। প্রেমিকের কাছে সে আশ্চর্য্য পরিপূর্ণতা লাভ করে। সে এক, সে বিশিষ্ট, সে স্বতন্ত্র। ভোগের যে বস্তু সে তার

সমান-ধর্ম্মি বস্তু থেকে স্বতন্ত্ররূপে দেখা দেয় না। তার পরিচয় সমষ্টিগত। তার স্থান তার সমান-ধর্ম্মের যে কোন বস্তু নিতে পারে, আর নিয়েও থাকে। একটি বস্ত্রের অভাব অন্য আর একটি বস্ত্রের দ্বারা দূর হয়। এক জোড়া জুতোর অভাব অন্য আর এক জোড়া জুতো দিয়ে মেটে।

নারীর পরিচয় পুরুষ প্রথম স্থরু করেছে ভোগের পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে। তাই ভোগ্যবস্তুর নিয়ম অনুসারে নারী পুরুষের চোখে কখনই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নি। পুরুষের কাছে নারী চিরকাল সমষ্টিগতরূপে দেখা দিয়েছে। তাই পুরুষের জীবনে একটি নারীর স্থান এত আশ্চর্য্য অল্প সময়ের মধ্যে আর একটি নারী গ্রহণ করতে পারে। বহু বৎসরের ঘনিষ্ঠতাও নারীকে পুরুষের কাছে ব্যক্তি করে তোলেনি। সে ভোগের বস্তু, সে তো প্রেমের বস্তু নয়। সে লোভের বস্তু, সে তো পূজার বস্তু নয়। তাই নারী সমান-ধর্ম্মের অসংখ্য ব্যষ্টির একত্রীকরণে যে সমষ্টি গঠিত হয় তারি একটি ব্যষ্টি, বিভিন্ন ধর্ম্মের ব্যষ্টির একীকরণে যে সমষ্টি তৈরী হয় সেই সমষ্টির ব্যষ্টি নয়।

বনের অসভ্য মানুষের কাছে নারী সেদিন যে ভোগের উপকরণ বলে পরিচিত হয়েছিল আজও নারীর সেই একই পরিচয় রয়ে গেছে। যে ভোগী তাকে নিজের ভোগকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে নিয়মের সৃষ্টি করতে হয়। তাকে অন্য ভোগীর লুব্ধতা থেকে নিজের কাম্য বস্তুকে বাঁচাবার জন্যে আচারের, সূত্রের, আইনের সৃষ্টি করতে হয়। ভোগী তার নিজের বীভৎস লেলিহান বুভুক্ষার ছবি অন্য ভোগীর মধ্যে দেখতে পেয়ে ভয়ে ত্রাসে কম্পিত হয়। সেই লোভ ভয় বীভৎস লোলুপতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক বিধান। এই বিধানগুলির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি মন-গড়া পাপের সৃষ্টিও করা হয়েছে। আর তার তেমনি মন-গড়া দণ্ডের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ভোগের যে একটা বৃহৎ ক্ষেত্র আছে, যেখানে ভোগের আর ত্যাগের মধ্যে কল্পিত সীমানা আর থাকে না, ভোগ আর ত্যাগ এক হয়ে যায়, যেখানে লুব্ধতার দ্বারা নয় উপলব্ধির দ্বারা ভোগ হয়, যেখানে অপরকে বঞ্চিত করে নয় অপরের স্বেচ্ছার দানের দ্বারা ভোগ হয়, সে ভোগ পুরুষের সৃষ্ট সমাজ সেদিন কল্পনাতেও ধারণা করতে পারে নি। পুরুষ ভোগী, নারী ভোগ্যবস্তু। ভোগ্যবস্তুকে সম্পূর্ণ রকমে হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে কেমন করে ভোগ করতে হবে তার সমস্ত সুব্যবস্থা সমাজ করেছে। পুরুষ ব্যক্তি নারী সমষ্টিগত। নারীর জীবনে ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনা, লাভ-ক্ষতির অস্তিত্ব পুরুষের তৈরী সমাজ স্বীকার করেনি। ভোগ্যবস্তুর আবার স্বাধীন আনন্দ-বেদনা লাভ-ক্ষতি কি? তার একমাত্র সার্থকতা ভোগীর কতটা আনন্দ বিধান করতে পারল তার উপরে। নারীর আত্মা আছে কি নেই তাও পুরুষ সন্দেহের কারণ বলে মনে করেছে। ভোগী যখন মরল তখন তার ভোগ্যবস্তুকেও তার সঙ্গে মরতে হবে। অতএব নারীকে দেবী বানিয়ে আধ্যাত্মিক সুষমা দিয়ে ঘিরে তাকে শবের সঙ্গে পুড়িয়ে মার। ভোগীকে দেবতা বানালে জীবনে মরণে, নারীকে সারা জীবন সেবাদাসী করে রেখে তাকে বধ করবার সময় দেবী তৈরী করলে! জীবনে সেবাদাসীকে সতীত্বের মোহে মুগ্ধ রাখবার কত শত উপায়ই না সমাজ করেছে! একপরায়ণ নারীর প্রেমের অবদান বহুনারীপরায়ণ পশু-পুরুষের পায়ের তলার ধূলায় নিষ্ঠুর ভাবে কুৎসিৎ ভাবে অহোরহ দলিত হচ্ছে।

মনুর সৃষ্ট মানবসমাজ নারীর সতীত্বের যে ছক কেটে দিয়েছে তাতে ধূর্ত্ত লোভী পুরুষ-পশু নারীকে এই অত্যন্ত সহজ কথাটি অত্যন্ত ঘোরালো করে. অনর্থক কতকগুলো কথার সৃষ্টি করে বোঝাতে চেয়েছে যে সতীত্ব মানে হচ্ছে নির্ব্বিচারে পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ। পুরুষের পদতলে নিজেকে একান্ত ভাবে সমর্পণ করেই নারী তার জীবন সার্থক করতে পারে, এছাড়া নারীর আর অন্য কোন পন্থা নেই সার্থকতা লাভের। এমনি ভাবে নিছক কথার ফাঁকি দিয়ে পুরুষ নারীর দেহের

ও মনের সমস্ত মাধুরী নিঃশেষে লুণ্ঠন করে চলেছে। আর অসহায় নারী এই বাধ্যতামূলক আত্মদানের পরিবর্ত্তে কেবল স্বর্গ ও মোক্ষপ্রাপ্তির কামনাকে মনের সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সান্ত্বনা লাভ করছে। এজীবনের বিরাট শূন্যতাকে কাল্পনিক ছায়ালোকের আনন্দ দিয়ে ভরিয়ে তুলছে। এজীবনের ব্যথার পাত্র পরজীবনের চির-নিঃস্পন্দিত আনন্দ-ধারায় পূর্ণ হবে কল্পনা করে সে দিনের পর দিন আঘাতে জর্জ্জরিত হয়েও হাসিমুখে সমস্ত বেদনা বহন করে চলেছে।

এম্নি করে মাংস-লোলুপ পুরুষের লোভে নারী পঙ্কের মধ্যে নেমে দাঁড়িয়েছে, আর অসহায় ধর্ষিত নারীর ওপারের স্বর্গ-লোভের ফলে এপারে মানবের ঘরে-ঘরে যে-স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হবার প্রতীক্ষায় আথারি বিথারি করে মরেছে সে-স্বর্গ প্রতিহত হয়ে ফিরে গেছে। লোভের পাষাণের তলে নর-নারী সুন্দরকে তিলে তিলে মেরে এসেছে। কবে বিশ্বের জাগ্রত চেতনা এই লোভকে ধ্বংস কববে?······

বলতে বলতে পথ স্তব্ধ হোয়ে গেল। চেয়ে দেখি দূরে পূর্ব্ব গগনে আলোর রেখা দেখা দিয়েছে। পথের ধূলো আবার পথের পাশ থেকে সরে এসে পথকে আবৃত করে দিল। দূর থেকে পথিকের পদধ্বনি কানে এল। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলুম।

আমাদের এই কুঁড়ে ঘরখানি—

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আমাদের এই কুঁড়ে ঘর খানি
বিলের কূলে
আঙিনা ছেয়েছে রাঙা রাঙা কত
জঙ্‌লা ফুলে।
বাদলের দিনে তরু-ছায়াতলে
এ কালো-বিলের ঘন কালো জলে
এপার ওপার আঁধারে আবরি'
কি মায়া ঢুলে!
কুঁড়ে ঘরখানি ছবির মতন
বিলের কূলে।

ভোর হ'তে কেউ ডিঙি বেয়ে যায়
গাঁয়ের লোকে
আব্‌ছা আলোয় স্বপনের মতো
লাগে এ চোখে।

রোদ হেসে ওঠে, হাসে বিলখানি,
দুলে দুলে ওঠে কি মোহে না জানি
জলে ডোবা ডোবা ধান ক্ষেতগুলি
নেশার ঝোঁকে—
স্বপনের মতো লাগে এ সকল
আমার চোখে।

ধান শীষে শীষে শিহরিয়া ওঠে
পাখীর গান
ফড়িঙেরা ওড়ে ভোরের আলোক
করিয়া পান।
'ভেসাল'-জেলের জাল ঘিরে দূরে
কাক চিল যত ওড়ে ঘুরে' ঘুরে'
—বিলের প্রান্তে আকাশের মেঘ
করিছে স্নান।
কাশ-বনে ডাকে কোড়া পাখীগুলি
কাঁপায়ে প্রাণ।

বোঝাই-নৌকা ধীরে ধীরে চলে
গঞ্জ-পানে
পল্লীকিশোরী পলকে চকিত
দৃষ্টি হানে।
দেখে সে, নৌকা চলে ছলছলি'
শাদা-শাদা কত না'ল-ফুল দলি'
—মাছরাঙাগুলি উড়িছে ঘুরিছে
লুব্ধ প্রাণে;
—চির পরিচিত কাকের কণ্ঠ
পশিছে কানে।

দূরে নীল নীল টিনের চালায়
কাকের মেলা
পিছনে সবুজ উপরে শুভ্র
মেঘের খেলা।
—তরুপল্লবে ছায়া-করা পথে
আলোকের কণা ঝরে শতে শতে
ঝিক্ ঝিক্ করে ছায়ার উপরে
সারাটি বেলা
—ছায়ার বক্ষে আলোক-শিশুর
মধুর খেলা।

আমাদের এই চালের উপরে
কুম্‌ড়া ফুলে,
লাউয়ের লতায়, জবাফুল গাছে,
তুলসী মূলে—
সাদা রোদটুকু হেসে ওঠে ভোরে
চপল-লীলায় যায় দোর-গোড়ে
চিক্‌চিক্ করে হেথায় হোথায়
বেড়ায় দুলে
ছবিতে মাচাঙে, মাটির দেয়ালে,
জানালা-মূলে।

পাশে ও-বাড়ীর খড়ের গাদায়
ছেলের দল
দস্যি-পণায় মিটায় তাদের
কৌতূহল।
ধমক্ শুনিয়া থামে, ফের মাতে
তারি কৌতুক হেরি প্রতি প্রাতে
গানের মতন সুরে ভরি' ওঠে
পল-বিপল

জীবনের লীলা ফুটে ঝরে কত
গাঁয়ের তল।

* * * *

দিক্-জোড়া এই কাজলী-বিলের
কাজল-জলে
রাতের আঁধার ঘনায় যখন
ছায়ার তলে—
আকাশ জুড়িয়া চেয়ে রয় তারা
রাত্রি-পাথারে সম্বিৎ-হারা
বিপথী মাঝির নায়ের প্রদীপ
থমকি' জ্বলে—
তিমিরের পানে চাহিয়া মাঝির
পরাণ টলে।

জ্যোছনা-সাঁজের ভাঙা চাঁদখানি
কুটীর পরে
ছবির মতন চেয়ে থাকে শাদা
মেঘের থরে।
হাসে তার আলো শিশুদের মুখে
শেফালির পাতে, বনানীর বুকে
সারা-বিল ভরি' কুমুদীর হাসি
উছলি' পড়ে
শরৎ রাতির স্মৃতির স্বপন
ভুবন ভরে।

* * *

ঘিরিয়া মোদের খড়ো-চাল এই
কুটীর-খানি
সারা দিন রাত কত গান ওঠে—
অবাক্ মানি।

জাল বোনে বুড়ো, গায় নিজ মনে
গৃহ কাজে রত বধূ গৃহ কোণে
মেঘলা বেলায় ছেলেরা ঘুমায়
কাঁথাটি টানি—
সবি যেন লাগে ছবির মতন,
অবাক্ মানি।

জীবনের এই ছোট খাটো কাজে
কত না সুরে
কত গান শুনি নিতি নিতি এই
পল্লী-পুরে।
আকাশের কোণ মেঘে ভরা আজ
থেকে থেকে ঘন গরজিছে·বাজ,
দুপুর ঢলেছে—রাত এলো যেন
ভুবন জুড়ে'
ভিজে ভিজে বধূ মাজিছে বাসন
হোথায় দূরে।

চলায় ফেরায় মধু চাহনিতে
ব্যস্ততায়
সেবায়-সরমে লীলায় কি যেন
মহিমা ছায়।
শীতের রাত্রে উনানের পাশে
বসে' বসে' মনে কত কথা ভাসে—
রান্না ঘরের ধোঁয়া ঘুরে' ঘুরে'
আকাশে যায়,
অলস স্বপন তারি সাথে সাথে
পরাণ ছায়।

আমার এ গান কুটীরের গান
—আমি যা শুনি
অলস-বেলায় এই গৃহ-কোণে
স্বপন বুনি।
—ঘাটের কোণায় নিরমল মুখ
কানে আসে শুধু রিনি ঝিনিটুক্
টুং টাং করে বাসন-কোষণ
গেলাস-গুনি।
আমি শুনি আর বসে বসে শুধু
স্বপন বুনি।

শুনেছি অনেক ভাঙনের গান,
—লাগে না ভালো
আমি চাই এই মধু হাসিটুকু
—এটুকু আলো।
কালো বিলখানি, এ ছোটো কুটীর
এই কোন্‌টুকু সারা-পৃথিবীর
চাঁদিনীর হাসি, মেঘে ঘন ছায়া
কাজল-কালো,
শুধু এইটুকু সুমধুর হাসি,
এটুকু আলো।

বান-ভাসি

—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর—

শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বুড়ো আর বুড়ী—।

আর বুড়োই বা বলি কেমন করিয়া? দাঁত ভাঙিয়াছে, কিন্তু চুল পাকে নাই। হাসিতে হাসিতে নিজেই সে রসিকতা করিয়া বলে, "বুড়ো যে,—সে এক-পা হাঁট্তে দশ-পা পিছিয়ে চলে।"

বুড়া চলার বড়াই করে।

কিন্তু তাহার পায়ের পানে তাকাইলে হাসি পায়।

নিজে সে এক পায়ে হাঁটে।

আর একটি পা তাহার কাটা পড়িয়াছে।

কিন্তু এই কাটার ইতিহাস তাহার মুখে মুখে। নিজেই সে হাসে আর বলে, "এম্নি ঠেঙ্গোধারী আমাদের এই মিহিরপুরেই ছিল সাতটি। ভিটে-মাটি বেচে-খুচে সব থানান্তরিত্ হলো।"

দুই বগলে দুইটি ঠেঙ্গো লইয়া তাহাকে পথ চলিতে হয়।

কাঁকর পাথরের রাস্তার উপর ঠুক্ ঠুক্ করিয়া শব্দ উঠে,—পথের ধারে দাঁড়াইয়া গয়ারাম তাহার পায়ের পানে তাকায় আর হাসে।

বুড়া বলে, "হেসো না বাবা মাড়োয়ারীর ডিম,—হেসো না ফ্যা ফ্যা করে'! বুঝলে?"

গয়ারামের হাসি তবু বন্ধ হয় না।

বুড়ার রাগ হয়। একটুখানি কাছে সরিয়া গিয়া বলে, "কয়লা-কুঠিতে তখন খাদ সরকারী করি। জোহান্ না বোহান্ বলে' এক-বেটা সাঁওতাল—তারও ঠিক এম্নি। দেখতাম আর হাসতাম। বাস্! বহুৎ বহুৎ করে পাপ—সময় হলে ফলে। আবার তোকেও কোন্ দিন বুকে হাঁটতে দেখব। হাসিস্‌নে।"

কথাটা গয়ারাম হয়ত মন দিয়া শোনে না। হাঁটু অবধি ঝোলা জামার বড় বড় দুইটা পকেটে হাত দিয়া ঝম্ ঝম্ করিয়া টাকা বাজায়।

বুড়ার আপাদমস্তক জ্বলিয়া ওঠে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলে, "কি বাবা, টাকার গরম নাকি?"

ঘাড় নাড়িয়া গয়ারাম বলে, "না। সুদের গরম। টাকার সুদ।"

বুড়া আর দাঁড়ায় না। কিছু বলেও না। আপন মনে ঠুক্ ঠুক্ করিয়া আগাইয়া চলে।

চলার কিন্তু কামাই নাই।

এদিকে হাটতলা,—ওদিকে নদীর ধার।

সারাদিন যেন সে তাঁত-বোনাবুনি করে।

কেন যে করে তা সে-ই জানে।

হাটতলায় একবার দাঁড়ায়।

পানের গাঁট নামিয়াছে।

গুনিয়া গুনিয়া হারু সেগুলি দোকানে তুলিতেছিল।

বলিল, "এসো কত্তা, এসো—বসো!"

"বসি—।"

কেরোসিন কাঠের বাক্সটির উপর হারুর ভাই বসিয়া ছিল। হারুর চোখ টিপুনির ইঙ্গিতে সে টপ্ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

"বসুন কত্তা—বসুন!"

কত্তা বসে। ঠেঙ্গো দু'টি দু'পাশে নামাইয়া রাখে, আর আপন মনেই বলে, "হাসি? আচ্ছা বাবা!"

তাহার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুর করিয়া টানিয়া টানিয়া বলে, "হেসে নাও দুদিন বৈ ত' নয়—।"

হারুও হাসে। বলে, "কে হাসছে কত্তা?"

কত্তা জবাব দেয়,—"ওই বেটা মেড়ো, বেটা মাড়োয়ারী, বেটা গয়া, বেটা বে-জাত, বেটা বিদেশী কাঁহাকা—!"

"দেখ দেখি অন্যায়।"—বলিয়া হারু একটি গোটা পান কত্তার হাতে দিয়া বলে, "ধর, কত্তা ধর।"

ঘাড় নাড়িয়া কত্তা বলে, "উঁহুঁ! গাঁট্ট যে দিন নাম্‌বে সে দিন ছুটি।"

"আচ্ছা।"—হারু ছুটিই দেয়।

"শোন্!"

গোপনে কি একটা কথা বলিবার জন্য কত্তা উঠিতে চায়। হারু বুঝিতে পারে, বলে, "শুনি, কত্তা শুনি। বসো—তামাক খাও।"

কত্তার দেরি আর সয় না। গোপন কথা প্রকাশ্যেই বলিয়া ফেলে।

"টাকা ক'টা কাল-পরশুর ভেতর দিয়ে দিস্ হারু। চলে যাব এখান থেকে।"

হারুর ভাই তামাক সাজে।

হারু বলে, "দেব বই-কি!"—বলিয়াই কথাটা সে পাল্‌টাইয়া লয়।

"দেখ দেখি অন্যায় বেটা মেড়োর! তোর যদি অম্‌নি যেতো কাটা?"

পান দুইটি দুম্‌ড়াইয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া কত্তা বলে, "হুঁ-ম্! পা কি আর অম্‌নি কাটে রে বাবা, কাট্‌লো শুধু ওই কলের দায়ে। কাগজের কল—তা এখানে কেন বাপু? ছেলে গুলে ত কাগজ কলমে লিখে লিখে সব কাটিয়ে দিলে!"

কাগজ-কলের উপর বুড়ার ভারি রাগ।

"কল এলো না যম এলো! গাঁয়ের সদর রাস্তার ওপর লাইন বসলো। দিন নাই রাত নাই—ঘেচাং ঘ্যাচ্ ঘেচাং ঘ্যাচ—গাড়ী চল্‌ছে ত' চল্‌ছেই! কত আর হাৎড়ে হাৎড়ে চলবে বাবা লোকে? বেখড়কা গিয়ে পড়লাম লাইনের ওপর—বাস্, মাথা যায়নি এই খুব।"

হুঁকাটি হাতে দিতেই কত্তা তামাক টানে। টানিতে টানিতে গাল দুইটা তাল-তোপ্‌ড়া হইয়া যায়। থামে আর বলে,

"যাবে না কেন? মাথাও গেল। দুধের কেঁড়ে মাথায় নিয়ে গয়লাবুড়ী সেই যে দুধ বেচতে গেল ত গেলেই—একেবারে জন্মের মতন গেল। মারে হরি ত' রাখে কে? বাবা ইঞ্জিন এসে পড়লেন ঘাড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে খতম্! চাকার তলায় পিষে-মেড়ে' বুড়ীকে একেবারে ডাব-ডেলাটি করে ছেড়ে দিলে। দেখে এলাম—দুধে আর রক্তে ঠাঁইটা তখন মাখামাখি!"

বুড়া একটু থামে, হুঁকাটা বার-দুই টানে, তারপর আবার বলে, "ওই যে ফটক দেখছিস লাইন-ধারে,—ওই ফটক সেই তখন থেকে।"

হারুর ভাই দোকানের চালায় দাঁড়াইয়া গল্প শোনে। বলে, "কিন্তু টাকা ত' পেলেন কত্তা—ওই কল থেকেই!"

"টাকা পেলাম না গুষ্টির মাথা পেলাম!"

চোখ তুলিয়া বুড়া একবার হাসে। হাসিয়াই বলে, "টাকা,—জমি গেল, জায়গা গেল—টাকা! টাকা ভেঙে ভেঙে খেতে হবে ত? না কি বলিস্ তুই? হারুর ভাই চারু,—না কী নাম রে তোর?"

"আজ্ঞে না, আমার নাম পিতাম্বর।"

"পিতাম্বর? বেশ বেশ।......ওই যে দেখছিস কুলি-বারিক আর ওই মদের ভাটি—ও-সব আমার জায়গা। ধানের মাঠ ছিল সব। ছ'শ টাকা বিঘে পেলাম—দিলাম ছেড়ে। তাও কাড়াকাড়ি মারামারি বাবা—সে কি আর পড়তে পায়? শহরের ওই তেল-কলের মাড়োয়ারী-বেটা বলে আমায় দাও, আর এদিকে কাগজ-কলের সায়েব বলে আমায় দাও।"

কথা বলিতে বলিতে আগুনটা বোধকরি নিবিয়া গিয়াছিল, বার-কতক ফুঁ দিয়া কলিকাটা কত্তা হারুর হাতে দিয়া বলিল, "ধরা—

"টিকে-মহল্লায় কিছু পাব, আর এই তোর কাছে কিছু,—শুঁড়ি বেটার কাছে গোটা-পঁচিশেক। বাকি সব আদায় করেছি। এইবার ঘরবাড়ীর একটা কিছু ব্যবস্থা করেই—দে চম্পট! একেবারে শ্বশুরবাড়ী।"

পিতাম্বর টিকে ধরাইতেছিল। পিছন্ ফিরিয়া বলিল, "শ্বশুরবাড়ী—?"

"হাঁ রে গুয়োটা,—শ্বশুরবাড়ী। রাজকন্তে ত' পেয়েইছি, এইবার রাজত্তি পেলাম।"

বুড়ার মুখে হাসি আর ধরে না! হাসে আর দাঁতের মাড়ি বাহির হয়। বলে,

"শ্বশুরের বিষয়—খাবে কে শুনি? শালা একটি ছিল, তাও ত' পটল তুলেছে।—উঠি।"

ঠেঙ্গো দুইটি বগলদাবা করিয়া বুড়া উঠিয়া দাঁড়ায়।—"সেখানকার জমি যে সে জমি নয়, বুঝলি হারু,—ডাক্‌লে সাড়া দেয়। পরন্তু আমি আর ফিরব না তা বলে' রাখছি—টাকা আমার চাই-ই।"

বুড়ার একটি মাত্র পায়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া হারু বলে, "ও আপনার যেদিন খুশী নিয়ে যাও কত্তা, কিন্তু আর কিছু না দিলে ত' চলে না দেখছি। ভাইকে নিয়ে এলাম দেশ থেকে,—আর-একটা দোকান খুলে দিই।"

বুড়া তখন চলিবার উপক্রম করিয়াছে; বেলের মত ছোট্ মাথাটি নাড়িয়া বলে, "উহুঁ। যাব ত' সম্পক্ষ চুকিয়ে দিয়েই যাব।"

হারু কিন্তু ছাড়ে না।—"সুদ ওই দু' পয়সা করেই রইলো কত্তা। ডুববে না আমার কাছে,—টাকা আমি পৌঁছে দিয়ে আসব, তা তুমি যেখানেই যাও, কাশী যাও আর মক্কা যাও .....টিকিট একটি তাহ'লে আনিয়ে রাখি —কি বল কত্তা?"

কিন্তু গিন্নিকে একবার না জিজ্ঞাসা করিয়া বলা অসম্ভব।

বুড়া বলে, "শুদিয়ে দেখব।"

কিন্তু শুধাইবে কি—গিন্নি ত' রাগিয়াই আগুন!

"ঠিরিক্ ঠিরিক্ করে' যাচ্ছ আর আসছ,—হলো কিছু ঠিক? বল, নইলে আমি আমার পথ দেখি।"

পান দুইটি গিন্নির হাতে দিয়া কত্তা বলে, "থামো না বাপু, দিন-দুই সবুর কর।"

গিন্নি রাগিয়া বলে, "তুমি কর। আমি কিন্তু চললাম।"

চোখ টিপিয়া কত্তা একটুখানি রসিকতা করিতে ছাড়ে না। বলে, "কার সঙ্গে?"

বলিয়াই হাসে।

গিন্নি বলে, "রাখো তোমার হাসি। হাসি দেখলে গা জ্বালা করে।"

বুড়ার হাসি বন্ধ হয়। এইবার সে গম্ভীর হইয়া ঠেঙ্গো দুইটি হাতের কাছে নামাইয়া রাখিয়া দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া চুপ করিয়া বসে। বসিয়া বসিয়া আপন-মনেই বলে, "হারুর কাছে পনরো, টিকে-মহল্লায় তিরিশ, আর মথন্ শুঁড়ির দরুণ পঁচিশ।—কত হলো?" আঙুল গণিয়া বুড়া হিসাব করে, "পনরো, তিরিশ আর পঁচিশে—সত্তোর। তারপর......একটি বিশেষী লোক—"

"লোক কি হবে শুনি?"

"লোক?"—বলিয়া বুড়া মুখ তুলিয়া চায়।—"দাঁও মারবে—দাঁও! প্যাঁচ্ কস্‌বে।"

বাঁ-হাতের তালুর উপর ডান-হাতের একটি আঙুল ঘুরাইয়া প্যাঁচ্ কসিবার ইঙ্গিতটা বুড়া তাহাকে দেখাইয়া দিয়া বলে, "একে হাঁক্‌বে তিন হাজার ত' ওকে বলবে—চার।"

বুড়ী বলে, "কত ঢংই না জানো! এসো চারটি গিলে নাও আগে।"

শান্-বাঁধানো রকের উপর বসিয়া বুড়ার স্নান্ হয় গরম জলে।

খাইতে বসিয়া কলাপাতার উপর ভাত দেখিয়া বুড়া বলে, "পাতা কেন?"

বুড়ী বলে, "থালা ঘটি সব ঢুকিয়ে ফেলেছি সিন্দুকে।"

"হুঁ-ম্! পাতার বুঝি দাম লাগে না?"

বুড়ী চুপ করিয়া থাকে।

বুড়া বলে, "দুধের রোজ বন্ধ করে দিয়েছ ত?"

"দিয়েছি।"—বলিয়া দুধের বাটিটা বুড়ী একটুখানি দূরে সরাইয়া ভাল করিয়া ঢাকা দিয়া রাখে।

তাহার পর বুড়া খায় আর বুড়ী ওদিকে পাশের ঘরে গিয়া কাঁদিতে বসে। এ-ঘর হইতে কান্নার শব্দ শোনা যায়। ভাই-এর জন্ম বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদে আর বলে, "বাপের ভিটে কতদিন মা দেখি নাই যে! কুল গাছের কুল আমি কবে খাব রে!"

অনর্থক এই কান্নাকাটি বুড়ার ভাল লাগে না। বলে, "কেঁদো না গো—কেঁদো না!"

বুড়ীর কান্নার জোর একটুখানি বাড়ে বই কমে না।

হাত-মুখ ধুইয়া বুড়া বলে, "তবে এই চললাম, তুমি কাঁদো বসে বসে।"

ঠেঙো ঠুক্ ঠুক্ করিয়া বুড়া সত্যই আবার বাহির হইয়া যায়।

বুড়ী তখন ঝাড়াঝুড়ি দিয়া ওঠে। দরজায় খিল বন্ধ করিয়া আসিয়া ভাত বাড়ে।

......দু' বাটি দুধ নিজেই খায়। গরম ভাতে এক ঢেলা ঘি না হইলে তাহার চলে না।

খায় আর ভাবে,—বুড়ার কপাল......!

বুড়া ঠিক যেমনটি চায় তেমনটি আর মেলে না।

থাকিবে, ভাড়াও দিবে, অথচ তাহার কাজ করিবে।

লোক পাওয়া কঠিন।

...কিন্তু শেষে একদিন মিলিয়াও গেল।

দুপুরে সেদিন ঘরে ঢুকিয়াই বুড়া বলিল, "লোক তোমার ঠিক হয়ে গেছে—শুনছো?"

বুড়ী শোনে, কিন্তু চুপ করিয়া থাকে।

বুড়া বলে, "বিশ্বেস হয় না? আচ্ছা, দেখে নিও সন্ধ্যে বেলা।"

কিন্তু সন্ধ্যা হয়......

লোক আর আসে না।

বুড়া দরজায় গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

এক পায়ে কতক্ষণই বা দাঁড়ায়!

ঘরে আসিয়া বসে। বলে, "এমন করে' বললে,—এ আবার কি হলো?"

সারারাত বুড়ার চোখে আর ঘুম নাই!

কেবলই মনে হয়—

...লোকটা একা নয়, সঙ্গে একটি মেয়ে আছে, লোকটির মাথায় এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, গলায় তুলসির মালা, ফিট্ গৌরবর্ণ ছোক্‌রা—বয়স বেশি নয়; পরনের কাপড়খানি গায়ে জড়ানো—খালি গা। মেয়েটি চমৎকার, যেমন রং—তেম্‌নি চেহারা, গায়ে সোনার গয়না। বৌ কি না কে জানে!...

মেয়েটিকে চুরি করিয়া কোনও দূর দেশ হইতে পলাইয়া আসে নাই ত?

হয়ত তাই। হয়ত সেই ভয়েই আসিল না।

হোক্ না! গাই-বাছুরে ভাব হয়—বনে গিয়াও দুধ দেয়। তাতেই বা ক্ষতি কি?

কিন্তু লোকটির মুখ দেখিয়া মনে হয় ভাল মানুষ। বলে, "বানে ভেসে এসেছি মশাই!"

হয়ত তাই!—যে বান!

"ঘুমোলে নাকি?"

বুড়ী ঘুমায় নাই, চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল। বলিল "কি?"

বুড়া বলে, "যাবে কেমন করে' শুনি? দামোদরে দু'কানা বান।"

বুড়ী চুপ করিয়া থাকে।

বুড়া আপন মনেই বলিয়া যায়,—"খেয়া একদম বন্ধ। গাঁ ভাসিয়েছে কি কম? কত মানুষ হাবুডুবু খেতে খেতে মরে' গেল—কত গরু, কত মোষ, ভেড়া...দু'জন ত' আজ এইখানে এসেই লেগেছে...আমাদেরই মিহিরপুরের ঘাটে গো! শুনছো?"

বুড়ীর রাগ হয়। বলে, "বেশ গো বেশ, যাব না—চুপ কর।"

বুড়া বলে, "রাগের কথা নয়—সত্যি..."

বুড়ী বলে, "আবার চেঁচায়!"

বুড়া বোধ করি ভয়েই চুপ করে।

খানিক্ বাদে চুপি চুপি বলে, "লোক যদি কাল না ঠিক করি ত'—"

বুড়ী পাশ ফিরিয়া শোয়।

পরদিন সকালে উঠিয়া বুড়ার আর তর্ সয় না। ঠুক্ ঠুক্ করিয়া কাগজ-কলের দিকে চলিতে থাকে।

··লোকটি কাল ঠিক ওই বড় সাহেবের বাংলোর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, আর মেয়েটি ছিল ফটকের পাশে—মেহেদী-বেড়ার আড়ালে। সাহেব নাকি তাহাকে কাজ দিবে বলিয়াছে। কাঠের কাজ। ছোক্‌রাটি হয়ত কাঠের কাজ জানে।

কিন্তু এখন তাহাকে পায় কোথায়?—বুড়া আবার আগাইয়া চলে।

অনেক কষ্টে অনেক অনুসন্ধানের পর সন্ধান মিলিল। নদীর ধারে প্রকাণ্ড লম্বালম্বি কুলি-ব্যারাকের পাশ দিয়া সোজা একটা রাস্তা চলিয়া গেছে,—তাহারই একেবারে শেষ প্রান্তে 'পুরানো-বাংলা'; এবং সেই পুরানো-বাংলার কাছাকাছি দোতলা একটা ঘরে জন-পঁচিশেক চীনাম্যান থাকে,—তাহারই নীচের তলার একটা কুঠুরিতে নূতন একজন লোক আসিয়াছে,—নাম কেহ জানে না, তবে মাথায় লম্বা লম্বা চুল, সঙ্গে নাকি একটি মেয়েও আছে।—এবং বড় সাহেব নিজে নাকি তাহাদের খুব খাতির করিয়া হাওয়াগাড়ীতে চড়াইয়া সেইখানে রাখিয়া আসিয়াছে।

বড় সাহেব নিজে......

কাজেই এই অভাবনীয় ব্যাপারটা বিশেষ কাহারও নজর এড়াইয়া যায় নাই।

সাহেবের বাংলো বেশি দূরে নয়। ছোট কুকুরটার গলার আওয়াজ সেখান হইতে দিব্যি শোনা যায়।

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বুড়া সেইখানে গিয়া হাজির।

কিন্তু ঢুকিতে ভয় করে। বেঁটে-বেঁটে কিম্ভূতকিমাকার চীনাম্যানগুলি অনবরত সেইখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। পেট-মোটা পাৎলুন্-পরা অমনি একটা বেঁটে মত লোক সেদিন ওই সুমুখের রেলিংএ হেলান্ দিয়া মিট্ মিট্ করিয়া তাহারই দিকে তাকাইতেছিল—তাহা সে স্বচক্ষে দেখিয়া গেছে।

চারিদিকে প্রাচীর-ঘেরা উঠানের এক পাশে ছোট একটি দরজা। উঠানটা লোহা-লক্কড়ে বোঝাই। বুড়া একবার উঁকি মারিয়াই ভিতরে গিয়া ঢুকিল।

উপরের দিকে তাকাইয়া দেখিল! ঘরে কেহ নাই বলিয়াই মনে হয়। সবাই হয়ত কাজে চলিয়া গেছে।

"যাঃ!—"

বুড়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল।

কিন্তু বুড়ার কপাল! ফিরিয়া যাইতে হইল না।

—প্রাচীরের ধারে প্রকাণ্ড লোহার একটা চাকা কাৎ হইয়া পড়িয়া ছিল; তাহারই আড়ালে সেই পেটমোটা চীনাম্যান্‌টা উবু হইয়া হেঁটমুখে গড়গড়ার একটা সট্‌কা টানিতেছে—বুড়া এতক্ষণ দেখিতে পায় নাই। আর তাহারই পাশে বসিয়া অবিনাশ। খালি গায়ে রোদে বসিয়া ছুরি দিয়া বাঁশ না কি একটা কাটিতেছে।

বুড়া খুব আস্তে আস্তে ঠেঙো ফেলিয়া চাকাটার এ-পাশে গিয়া দাঁড়াইল। দু' জনের একজনও টের পাইল না।

চিনাম্যানটা কথা কহিতেছিল। নীচের দিকে মুখ রাখিয়া কাঠের সট্‌কায় একটা করিয়া টান দেয় আর বলে,

"ফু-চুন্। আমাল্ নাম্—ফু-চুন্। বলা লক্কা কাম কলে। বলা লক্কা খুব ভালো।—ভেলি গুড্। হামাল্ সাত লক্কা।—সেভেন্।"—এইবার সে মুখ তুলিল। দুইটা হাতের আঙুল গণিয়া অবিনাশকে সে বুঝাইতে যাইতে-ছিল—'সেভেন' কাহাকে বলে,—এবং তাহার 'লড়্‌কা' কয়টি। কিন্তু তাহার সেই টানা-টানা ঘুলঘুলির মত

স্তিমিত চোখ দুইটি তুলিতেই চাকার ফাঁকে বুড়ার দিকে তাহার নজর পড়িয়া গেল।—"টুং কুন্ হ্যায় ?"

অবিনাশ পিছন্ ফিরিতেই চিনিতে পারিল।

"আসুন! আসুন! কাল আর যাইনি মশাই। মিলে গেল যাহোক্ একটা-কিছু.. ...তাই বলি আর—"

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অবিনাশ সশঙ্কিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

জুতার শব্দ পাইবামাত্র বুড়াও পিছন ফিরিল।

—বড় সাহেব স্বয়ং!

পিছনে একটা কুকুর, এবং কুকুরের পিছনে কলের বড়বাবু; পরণে খাঁকির পাৎলুন, চোখে চশমা। বুড়া তাহাকে চেনে।

সাহেব আর কোনো দিকে তাকায় না—একেবারে সুমুখের ঘরে গিয়া ঢোকে।

কুকুর ও বড়বাবু বাহিরের বারান্দায় একটুখানি দাঁড়ায়।

অবিনাশ তাড়াতাড়ি ঘরের দরজার কাছে আসিয়া বলে, "এই যে আমি—"

সাহেব ঘরের মেঝের উপর দাঁড়াইয়া এদিক্-ওদিক্ তাকায়। বোবা মেয়েটা তখন জানালার কাছে পিছন্ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

সাহেব একবার মাথার উপর কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া বলে, "পানি গিরে ?"

অবিনাশ হাসে। বলে, "পানি গিরবে কি সাহেব ? দোতালা ঘর যে!"

সাহেব জানালার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখে।

—"বেডিং কিদার হ্যায়—তুমারা বেডিং ?"

সাহেবটা কি পাগল নাকি ?

অবিনাশ বলে, "বেডিং কোথা পাব সাহেব! এখন খেয়ে বাঁচি—তারপর বেডিং।"

সাহেব এইবার ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়।

সেই অবসরে অবিনাশ বড়বাবুকে বুঝাইয়া বলে, "গোটা-কয়েক টাকা যদি আমায় আগাম্ দিইয়ে দেন্ ত' একটা কম্বল-টম্বল কিনি—আর হাঁড়ি কল্‌সি, খাবার আসবাব—কিছুই ত' নেই।"

বড়বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলে, "আচ্ছা—।"

সাহেব উঠানে গিয়া পকেট হইতে একটা চুরুট্ বাহির করিয়া টানিতে থাকে। তাহার পর বড়বাবুকে কাছে ডাকিয়া আঙুল বাড়াইয়া এদিক-ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া ইংরাজিতে কি যেন বুঝাইয়া দেয়।

বড়বাবু ডাকিল,—"অবিনাশ!"

অবিনাশ কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

"এই যে পাঁচির দেখছো—এই পাঁচির-বরাবর লম্বা একটা টিনের সেড্ তৈরী করতে হবে। বড়দিনেব সময় সাহেবদের জিম্‌খানা হবে এই খানে। পারবে ত ?"

অবিনাশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বেশ।"

"আজ আমার বাসা থেকে তোমাদের খাবার আসবে, রাত্রে একটা বিছানাও দেব পাঠিয়ে, আর কাল থেকে যাহোক-কিছু ব্যবস্থা করা যাবে।"

বুড়া তখনও সেই চাকার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সাহেব এতক্ষণ সেদিকে ততটা নজর দেয় নাই। এইবার চেঁচাইয়া উঠিল, "কেয়া মাংটা টোম্ ?"

বড়বাবু ইংরাজিতে বুঝাইয়া দিল যে, সে কিছুই মাগে নাই,—এই গাঁয়েই উহার ঘর, লোককে টাকা ধার দেয়, আর সুদ আদায় করে। লোকটা সুদখোর।

সাহেব বলে, "ভাগো—ভাগো! রুপিয়া টোমারা কই নেই মাংতা—ভাগো হিঁয়াসে!"

বুড়ার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হয় না। ধীরে ধীরে ঠুক্ ঠুক্ করিয়া 'হিঁয়াসে ভাগিয়া' যায়।

আধ-ঘন্টাখানেক পরে বড়বাবু আবার ফিরিয়া আসিয়া বলে, "ওহে, তুমি এক কাজ কর—।"

ছুরি দিয়া অবিনাশ তখনও সেই বাঁশটা চাঁচিতেছিল, বলিল, "কি কাজ?"

বড়বাবু বলিল, "এখানে তোমাদের থাকা হবে না।"

অবিনাশ বলিল, "বেশ—"

"সাহেবের বাংলার কাছে দুটো ঘর খালি আছে, যাও, তোমার বৌকে নিয়ে সেইখানেই যাও। সাহেবের কাছে টাকা নিয়ে খাওয়া-দাওয়ার জোগাড়-যন্তর্ করগে যাও।"

বড়বাবুর আর দাঁড়াইবার অবসর ছিল না।

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিল, "এক্ষুনি?"

দরজার কাছ হইতে বড়বাবু বলিল, "হাঁ হাঁ, এক্ষুনি।"

অবিনাশ আগে—

বোবা-মেয়েটি পিছনে—

আবার তাহারা পথে আসিয়া দাঁড়ায়।

বড়বাবু বলিয়া গেল—তোমার বৌ......

অবিনাশ পিছন ফিরিয়া দেখে।

* * *

পথের ধারে আবার সেই পা-কাটা বুড়ার সঙ্গে দেখা।

তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বলে, "টাকার গরম। বুঝলে ভাই? মেনি-বাঁদরের মত মুখ নিয়ে বেটা বলে কি না ভাগো!—আবার যাও কোথা তোমরা?"

চলিতে চলিতে অবিনাশ বলে, "বাংলার কাছে দুটো নাকি ঘর খালি আছে।"

বুড়াও সঙ্গে সঙ্গে চলে।—"তুমিও যেমন! মেয়েছেলে নিয়ে থাকে ওই বেটা জানোয়ারদের কাছে কখনও? তার চেয়ে চল—আমার ঘরেই চল—বুঝলে?"

অবিনাশ বলে, "কাজ?—খাব কি?"

বুড়া একটুখানি ভাবিয়া বলে, "কাজ? একটা দোকান-টোকান করবে যা-হোক্ কিছু।"

"টাকা?"

বুড়া হাসিয়া বলে, "টাকা? তোমার আবার টাকার ভাবনা? বৌএর গায়ে অত গয়না থাকতে টাকার ভাবনা কি? বুঝলে? গয়না জিনিষটা ভারি মজার। আভরণ পেট-ভরণ দুই-ই! বুঝলে?"

বুড়া হাসে।

অবিনাশ বলে, "গয়না ও দেয় না কিছুতেই দেখেছি।"

বুড়ীর কথা মনে পড়ে। বুড়া একটুখানি ভাবিয়া বলে, "আচ্ছা, না দেয়—কুছ্ পরোয়া নেই! টাকা আমি দেব। তারপর দু'এক টাকা যেমন করে' পার শোধ করো। বুঝলে?"

অবিনাশ একটুখানি ভাবে। বলে, "আচ্ছা, তাই দেখি। এখানে যদি তেমন কিছু সুবিধে না হয় ত'..."

কাছেই সাহেবের বাংলো। বুড়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

"আচ্ছা দেখো—কিন্তু আজকালের মধ্যেই। নইলে আর পাবে না কিন্তু। রক্ষিতমশাই বল্লেই—সবাই চেনে আমায়। বুঝলে? আমরা এখান থেকে চলে যাব কিনা—তাই এত গরজ···নইলে—"

বুড়ার আর আগাইতে সাহস হয় না—পিছন ফিরিয়া আবার বলে, "সোজা, ঠিক ওই বাজারের মোড়ে—বাঁ-হাতি। হাটতলার কাছেই। রক্ষিত,—রক্ষিতমশাই ...বুঝলে?"

অবিনাশ ঘাড় নাড়িয়া বলে, "বেশ—!"

ঘর-দু'খানি বাংলোর পিছনে। বোধ করি সাহেবের বাবুর্চ্চি খানসামার জন্য তৈরী।

অবিনাশ বাজার হইতে একে-একে জিনিসপত্র লইয়া আসিল।—চাল, ডাল, তেল, তরকারি, হাঁড়ি-কলসি,—খাবার জন্য যাহা কিছু দরকার, সবই।

বোবা-মেয়েটি হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অবিনাশ হাতের ইসারা করিয়া বলিল, "রাঁধ্‌তে জান ত? রাঁধো—। ঝপ্‌ করে' আমি নুন নিয়ে আসি দু'পয়সার। ভুলে গেছি।"

নুন আনিতে আবার সেই হাটতলা। অনেকখানি পথ।

অবিনাশ নুন আনিতে যায়।

দোকানী বলে, "দাঁড়াও কত্তা, টাকার ভাঙানি নাই।"

দেরি হয়।......

নুন লইয়া অবিনাশ ফিরিয়া আসিয়া দেখে, বাহিরের চালায় জ্বলন্ত উনানের উপর ভাতে ধোঁয়া উঠিতেছে—ধরিয়া পুড়িয়া একেবারে গন্ধ উঠিয়া গেছে। তরি-তরকারি এদিক-ওদিক ছড়ানো,—তেল সুদ্ধ মাটির পাত্রটা কাকে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

ব্যাপার কি?

অবিনাশ দেখে ঘরের ভিতর হইতে দরজায় খিল বন্ধ। ক্রমশ—

আজি এই প্রভাতেরে কর নমস্কার

শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

আজ এই প্রভাতের আশীর্ব্বাদখানি
লও তব মাথে,
হে নগরী,
—লও তব ধূলি-ধূম-ধূম্র-জটা-বিভূষিত শিরে;
তব লৌহ-কাষ্ঠ-শিলা কারাগার হ'তে
রক্ত-মসী-কলঙ্কিত, যন্ত্র-জর্জ্জরিত তব
কর দুটি জুড়ি
আজি এই প্রভাতেরে কর নমস্কার।
মোহের দুঃস্বপ্ন-জাল বারেক ছিঁড়িয়া দুই হাতে
অভিশপ্তা,
চাহ ঊর্দ্ধে ওই নীল আকাশের পানে,
পূরব সীমান্তে, যেথা দিবসের মাঙ্গলিক বাজে
আলোকের সুরে।
তোমার ব্যথিত বক্ষে
অন্ধকারে যেথা,
অনির্ব্বাণ অগ্নিকুণ্ড জ্বলে দিকে দিকে,
হারায় কঙ্কাল-পথ বিকারের পয়োনালী মাঝে,

লুকায় সুড়ঙ্গ লাজ ভরে মৃত্তিকার তলে,
লোভ হিংসা ফেরে ছদ্মবেশে
অন্ধকারে নিঃশব্দ লোলুপ,
সেথা আজ ডেকে আন প্রভাত-আলোরে ;
তার সাথে আন শান্তি
লোভ-দীর্ণ তব ক্ষুব্ধ বুকে
লালসার দৈন্য যাক্ ঘুচে।
যন্ত্রের চক্রান্ত ভাঙি,
ভেদ করি ষড়যন্ত্র লৌহে আর লোভে
আসুক প্রভাতখানি
—সৌম্য-শুচি কুমার সন্ন্যাসী
হে পতিতা, তোমার আলয়ে।
পুঞ্জীভূত সমস্ত কালিমা,
সমস্ত সঞ্চিত ব্যথা, লজ্জা, গ্লানি, পাপ,
মনস্তাপ বহু মানবের,
ব্যাধি ও বিকার
সযত্নে লালিত,—
দূর হোক সব আবর্জ্জনা
আলোকের কল্যাণ-ধারায়।
শক্তির সাধনে মাতি,
হে উন্মত্তা নারী-কাপালিক,
অগণন জীবনের আশার শ্মশানে
আনন্দের শবাসনে বসি
সুন্দরেরে গিয়াছিলে ভুলি'
সীমাহীন আকাশের সুনীল বিস্ময়,
রাত্রির রহস্য আর আলো গন্ধ রূপ
ভুলেছিলে সহজ প্রাণেরে।
এই স্বেচ্ছা নির্ব্বাসন হ'য়ে যাক্ শেষ।
আজ তব
শক্তি-সুরা-রক্ত-নেত্রে ভ্রূকুটির তলে
বিহঙ্গেরা বাঁধে নাই নীড়,

প্রস্তর-নিষেধ প্রান্তে জাগিছে সভয়ে
শীর্ণ তৃণ বিবর্ণ কুসুম—
সঙ্কুচিত, দুর্ব্বল, কাতর।
যন্ত্রের জটিল পথে,
বিকলাঙ্গ জীবনের
হেরি শুধু ব্যঙ্গ-সমারোহ। *

* অধুনালুপ্ত 'সংহতি' হইতে।

অসংলগ্ন

আমরা সবাই মানি পিতামহদের যুগ থেকে আমাদের যুগ অনেক সরে এসেছে। সরে আসাটা ভাল কি মন্দ তা নিয়ে বিস্তর মতভেদ থাকলেও সরে যে এসেছে এবং একটু বেশী রকমই সরে এসেছে এ বিষয়ে কারু সন্দেহ নেই।

মোটামুটি বিশেষ কোনরকম গবেষণা না করেও গোটা-কতক পার্থক্য আমরা সবাই দেখতে পাই। সাধারণের সাদা চোখেও এই পরিবর্ত্তনের ধারাগুলি ধরা পড়ে। তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান আমাদের ইতিহাসে পাশ্চাত্য জগতের প্রবেশ। আমরা সবাই জানি যে, ইউরোপের ব্যাপারীদের জাহাজে শুধু আমাদের কাঁচা সস্তা রপ্তানির মাল রূপান্তরিত হয়ে বহুগুণ মূল্যে আমদানি হয়নি, তার সঙ্গে অদৃশ্য অনেক কিছু এমন আমদানি হয়েছে যা আমাদের জাতীয় ও সামাজিক জীবনের ধারা একেবারে বদলে দিতে বসেছে। জানি না এই আমাদের সনাতন সমাজের ইমারৎ কোনদিন একেবারে অটুট অটল ছিল কিনা, তবে আজ যে তার বহু জায়গায় ফাটল ধরেছে এবং তার বহু প্রাচীর টলমল করছে এ বিষয়ে কারু সন্দেহ নেই। নতুন যুগ তার প্রত্যেক ভিত্তি-মূল সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে সুরু করেছে।

বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক্। পশ্চিমের হাওয়া লাগবার আগে সমাজ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করবার প্রয়োজন বা অবকাশ কিছুই আমাদের হয়নি। একটি সুস্পষ্ট কঠিন আদর্শ আমাদের উচ্চতর জাতিগুলির সমস্ত সামাজিক আচার নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে। সেকালে সবাই হৃদয়হীন ছিলেন এমন কথা—আজকালকার সবাই দরদী—একথা বলবার মতই মিথ্যা; কিন্তু তবু বালবিধবার দুর্ভাগ্যের প্রতিকার করবার কোন চিন্তা তখন কারু মনে উদয় হয়নি। কারণ সামাজিক নিয়মগুলিকে আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের মতই অমোঘ বলে ধরে নিয়েছিলাম। অসবর্ণ বিবাহের যুক্তি পুরাকালের শাস্ত্রে থাকলেও আমাদের বৃদ্ধ ও তস্য বৃদ্ধ প্রপিতামহদের সে বিবাহের সম্ভাবনাও মনে জাগেনি।

এখনকার মত এ বিধি বিধান থেকে বিচ্যুতি তখনও ছিল, কিন্তু সে বিচ্যুতির বিচার করা আমাদের কারু প্রয়োজন মনে হয়নি। আমাদের কঠিন সামাজিক আদর্শের মাপ-কাঠিতে মেপে আমরা ব্যক্তির সমস্ত আচরণ পাপ বা পুণ্য এই দুই-এর যে কোন কোঠায় ফেলে দিতাম। মানুষের অসম্পূর্ণতা ও দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে বোধ আমাদের ছিল—না থেকেই পারে না—কিন্তু সমাজের অসম্পূর্ণতা আমাদের কল্পনারও বাইরে ছিল। তাই আমরা মানুষের সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি অসম্পূর্ণতা জটিল হতে জটিলতর প্রায়শ্চিত্ত বিধানের দ্বারা শুধরে নেবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলাম।

তারপর শতাব্দীর পাতা উল্টে গেল ও পশ্চিমের বাষ্পপোত ভাগিরথীর চোরাবালি পরাস্ত করে আমাদের কানের কাছে এসে তীক্ষ্ণ দীর্ঘ হুঙ্কার ছাড়লে।

আজ আমরা চাই বা না চাই আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে পশ্চিমের যন্ত্রযান চলেছে, আমাদের নদীর তীরে পশ্চিমের প্ররোচনায় আকাশভেদী কলের চিমনি উঠ্‌ছে, আমাদের মাঠে বাটে মরাই-এ পশ্চিমের সর্ব্ব-গ্রাসী ক্ষুধার টান পড়েছে। চোখ-কান বন্ধ করেও বাহিরকে অস্বীকার করবার উপায় আর আমাদের নেই।

শুধু বহির্জ্জগতে নয় মনের জগতেও পশ্চিমের চিন্তা, ভাব অমনি করে কলের চিমনি ও যন্ত্রযানের মত আমাদের সমস্ত প্রতিষ্টান ও সমস্ত পথকে সরিয়ে তার স্থানে অঙ্কুরিত হবার জন্যে লড়ছে। সেই লড়াই-এর ফলে তিনটি প্রধান দলের সৃষ্টি হয়েছে—

একদল প্রথম আঘাতেই মনের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুটিয়ে কূর্ম্মের মত শাস্ত্রের কঠোর শাসনের কঠিন বর্ম্মান্ত-রালে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, আর একদল নির্ব্বিচারে আত্মসমর্পণ করেছেন। এবং এই দুই দলের মধ্যবর্ত্তী আর এক দল মনে মনে বলেছেন ও বলছেন—রফা কর।

শুনতে মন্দ নয়—অনেকটা বিজ্ঞের মতই শোনায়।

'রফা কর।'—অর্থাৎ ধুতি থাক্, তার ওপর ইউরোপের সার্ট পর, কোট পর; সমাজে মেয়েদের স্থান অধিকার যেমন আছে তেমনি থাক্, কিন্তু বেশী বয়সে বিয়ে দাও, কলেজে পড়াও, গোড়ালি উঁচু জুতো পরতে পারে... রেলিঙে কাপড় শুকোতে দেওয়া হোক্, কিন্তু বাড়িটা যেন সাহেবি হয়...

কিন্তু মানুষের সার্থকতা জোড়া-তালিতে ত নয়। গণেশ বণিকের সিদ্ধিদাতা দেবতা হতে পারেন, মানবের মুক্তিদাতা তিনি নন।

দুই শক্তির টানে মধ্যপথ অবলম্বন করা জীবনের শ্রেয়ের পথ নয়—জীবন জ্যামিতি নয়। তার পথ হয় সত্য নয় মিথ্যা—সেখানে 'রফা' চলে না। অন্ধ শ্রদ্ধা ও দুর্ব্বল মোহ দুই-এরেই সেখানে মৃত্যু।

পিতামহদের যুগ থেকে সরে এসেছি সেটা দুঃখের কথাও নয় সুখেরও নয়। সত্যের পথ থেকে সরছি কিনা সেইটেই সব চেয়ে বড় কথা। যুগের ধর্ম্ম সরে যাওয়া, মানুষের ধর্ম্ম ধরে থাকা, শ্রেয়ের পথ সন্ধান করে ধরে থাকা। পিতামহদের যুগ থেকে সরে এসেছি বলে নবযুগ থেকে সরে দাঁড়াতে পারব না। সে যে-সব নূতন প্রশ্ন নূতন সমস্যা আমাদের সামনে আজ তুলে ধরেছে তার সমাধান করতেই হবে নির্ভীকচিত্তে,—পুরাতনের প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধা, নবীনের প্রতি দুর্ব্বল মোহ ও রফা করার পাটোয়ারী বুদ্ধি সমস্ত নির্ব্বিচারে বর্জ্জন করে।

আজ যদি প্রয়োজন হয় সমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত উপড়ে নূতন করে গাঁথবাব দুঃসাহস যেন আমাদের থাকে।

* *
*

নারীকে ঘিরে ঘরে-বাইরে আজকাল যে তর্কের তুফান উঠেছে তাতে স্বয়ং নারী দৃষ্টি-পথের আড়ালে তলিয়ে যাচ্ছেন। এক পক্ষ বলছেন, নারীর জাগরণের জন্যে নরের মাথা ব্যথা হ'লে কি লাভ হবে? অপর পক্ষ উত্তর দিচ্ছেন, জাগাতে হলে অপরেই জাগায়, নারীর ঘুম ভাঙাতে নরের মাথা ব্যথা হবে না ত কি—ইত্যাদি। প্রথম পক্ষ উপমার ছিদ্র পেয়ে বলেছেন, ঘুম যার অপনি ভাঙেনি তার কাঁচা ঘুম জোর করে ভাঙিয়ে পথের মাঝে তাকে টেনে এনে লাভ কি? দ্বিতীয় পক্ষ তখন আবার এ ঘুমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে বসেছেন এই বলে যে, এ ঘুম ক্লান্তির ঘুম নয়, এ ঘুম জড়তার ..

এমনি করে তর্কের জাল বেড়ে চলেছে। এবং নারী ততক্ষণ হেঁসেলের কাজকর্ম্ম সেরে চুল বাঁধতে বসে হয়ত স্বামীকে বলছেন, "মাথা যে নেড়া হয়ে গেল গো চুল উঠে উঠে, একটা ক্যান্থারাইডিনের শিশি এনো না আজ মনে করে—"

চুলের কথা যখন তুলেছি তখন শেষ করাই ভাল। এ আলোচনার মাঝে নারীকে চুল ধরে টেনে আনার দুষ্প্রবৃত্তি অবশ্য আমার নেই, কিন্তু নারীর চুল ছেড়ে দিয়ে নারী সম্বন্ধে আলোচনা হতে পারে এ বিশ্বাসও আমার নেই। ওই কেশ—আকর্ষণ করে নয়—অবলম্বন করেই এই আলোচনার গুটিকতক অতি স্থূল সুতরাং অতি উপেক্ষিত সত্যে পৌছোন যাবে এই আমার ভরসা।

নারীকে তত্ত্ব হিসাবে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা কোন কথাই ভুলি না, তার মাতৃত্বের মর্য্যাদা ও দায়িত্ব, সভ্যতার পক্ষে তার মনের ব্যবহারিক দিকের প্রয়োজন, তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা, তাদের সংখ্যাধিক্য, তার ওপর সমাজ শাস্ত্র আইন কানুন সকলের অবিচার, আর তার মস্তিষ্কের ওজন পর্য্যন্ত,—কিছুই ভুলি না; শুধু ভুলে যাই যে তার চুল বড়—তার জীবনে বড় চুল অত্যন্ত বড় কথা! Bobbed hair-এর ফ্যাশানে আজ তারা কয়েকজন চুল খাটো করতে পারে এবং হুজুকে পড়ে দুদিনের জন্তে চুল কেটে কেউ খোকা সাজতেও পারে, কিন্তু তারা এ চুল বাদ দিতে পারে না—তাদের সত্তার এই অঙ্গটি তারা ছেঁটে ফেলতে পারে বটে, কিন্তু কেটে ফেলতে পারে না।

এই দীর্ঘ কেশের কথা আমরা ভুলে যাই এবং সেই সঙ্গে আমরা ভুলে যাই যে, তার কণ্ঠে হার, তার বাহুতে বলয়, তার সারা অঙ্গে নর ও নারী উভয়ের বহুযুগের পরিকল্পনা। প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে আরও এক সূক্ষ্মতম সৌন্দর্য্যের স্তরে সে আপনাকে রচনা করেছে।

জাগরণের প্রয়োজন তার আছে, তাকে জাগাতে হবে; বেড়ি তার যা আছে তা ভাঙতেও হবে। কিন্তু শিকলি কাটতে তার চুল না কাটি ও বেড়ি ভাঙবার উন্মাদনায় তার সুন্দর বলয় যেন ভেঙে না বসি; সে বলয় তার নারীত্বের যে রূপের প্রতীক সে রূপ মানুষের সমস্ত সৃষ্টি-ব্যাকুলতার গোপন উৎস।—সে-ভাঙায় সভ্যতা লাভবান হবে না।

নারী পুরুষ নয়, শুধু মানুষও সে নয়, শুধু মাতাও না।

* *
*

১৯২৫ সালের নোবেল প্রাইজ পেয়ে শ্রীযুক্ত বার্নার্ড শ 'শেভিয়ান' ভাবে একটু রসিকতার লোভ ছাড়তে পারেন নি। বলেছেন,—"১৯২৫ সালে আমি কিছুই লিখিনি, বোধ হয় সেই জন্তই তাঁরা আমায় পুরস্কৃত করেছেন।" এই রকম বাঁকা জবাবে বিলেতের সাহিত্য-ক্ষেত্রে চেষ্টারটন্ ছাড়া তাঁর আর জুড়ি নেই। অবশ্য চেষ্টারটনের কথার ভঙ্গি একটু পৃথক। শ'এর বুলি শুধু বাঁকা নয়, ভোজালির মত বাঁকা এবং তাতে ধারও যথেষ্ট। সেই শাণিত বুলির আঘাতে ইংলণ্ডের ভিক্টোরিয়ান যুগের রাশভারি আত্মম্ভরিতাকে তিনি নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন। অতি প্রচণ্ড গাম্ভীর্য্যের ফানুষ একটি ছোট কথায় ফাঁসিয়ে অমন করে খেলো ও হাস্যাস্পদ করে দেখাবার ক্ষমতা আর কারু নেই। সে ক্ষমতা তিনি নির্ম্মমভাবে প্রয়োগ করেছেন। ধর্ম্ম রাজনীতি সমাজ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবীণ মত ও ধারণা অভ্রান্ত সত্য হিসাবে নিশ্চিন্তভাবে এতদিন রাজপাট চালাচ্ছিল তাঁর নিষ্ঠুর কলমের অব্যর্থ সন্ধানে তাদের সব সাঁচ্চা কাজ ঝুটা ও সব সোনা রাঙতা বলে তিনি ধরিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু খালি মতই তিনি থেঁৎলাননি, পথও বাৎলেছেন। Art for Art's sake তাঁর সাহিত্যনীতি নয়, তিনি প্রকাশ্যভাবে সাহিত্যে ঢেঁড়া পেটেন—সে ঢেঁড়াকে লোকের যে মৃদঙ্গের মত মধুর লাগে এইখানেই তাঁর বাহাদুরী—। তিনি যে আগে প্রচারক ও পরে শিল্পী তা তাঁর যে কোন বই খুললেই টের পাওয়া যায়। দীর্ঘ ভূমিকার পথ পার হয়ে তবে তাঁর নাটকে যাবার বন্দোবস্ত। সে ভূমিকার পথে পাঠককে তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করে বুঝিয়ে তবে তিনি নাটক শোনাতে বসেন। এই দীর্ঘ ভূমিকা লেখার রেওয়াজ নাটকের ইতিহাসে

নূতন।—তাঁরই প্রবর্ত্তন। উদ্দেশ্য ছাড়া তিনি বই লেখেন না।

এবার তাঁর ঘরোয়া খবর কিছু নেওয়া যাক্। শুনেছি তিনি লম্বা, পাৎলা এবং বয়স তাঁর সত্তর হলেও একেবারে খাড়া। তিনি নিরামিষাশী। একবার কে তাঁকে একটি ভেড়া উপহার দিয়েছিল। তিনি লিখেছেন, কোন মেষপালকের কাছে—সন্তানসন্ততি নিয়ে—তার এতদিনে বৃহৎ পরিবার হয়ে গেছে। এবং সেই সমস্ত পশম তাঁর ঘরে বছর বছর জমা হচ্ছে।

বর্ত্তমান বিবাহিত জীবনের নানান দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে বিস্তর লিখ্‌লেও তাঁর নিজের বিবাহিত জীবন অতি মধুর —। স্বামী-স্ত্রীতে অত্যন্ত বনিবনাও।

তিনি বেশীর ভাগ 'সর্টহ্যাণ্ডে' তাঁর সমস্ত লেখা লেখেন, সময় সময় 'টাইপ্‌রাইটার'ও ব্যবহার করেন, কখন সেক্রেটারীকে বলে যান।

তাঁর ভারী মজার কটি বিশেষত্ব আছে। তাঁকে উত্তরের খরচা দিয়ে টেলিগ্রাম পাঠালেও তিনি পোষ্টকার্ডে তার জবাব দেন। তাঁর পোষ্টকার্ড বিশ্ববিখ্যাত। পোষ্টকার্ডে ছাড়া তিনি চিঠি লেখেন না।

বিনয়ের বালাই তাঁর নেই। নিজের প্রশংসা তিনি মোলায়েম ভাবে করে যেতে পারেন। ভাবপ্রবণ তার ওপর তিনি ভারী চটা।

মানুষের জীবন-কাল বিজ্ঞানের সাহায্যে আরো অনেক দীর্ঘ করতে না পারলে, তিনি বলেন, মানবজাতির উন্নতি হবে না। কৈশোর যৌবনের প্রবৃত্তি-শাসিত মনের বিশৃঙ্খলা ভাল করে কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ত শমনের ডাক এসে পৌঁছোয়! ভাল করে জানবার বোঝবার ভাববার সময় থাকে কই?

তাঁর Back to Methuselahয় তিনি কল্পনা করেছেন, ভবিষ্যতে ডিম্ব-প্রসূত নরনারী বছর পাঁচেকের মধ্যে জীবনের প্রেম, সন্তান-উৎপাদন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ঝঞ্ঝাট সব সেরে বাকী দীর্ঘ জীবন জ্ঞানের সাধনায় কাটাবে।

তিনি নিজের দীর্ঘজীবন আশা করেন।

শ্রী কৃত্তিবাস ভদ্র

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক, ১এ, রামকিষণ দাসের লেন, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস হইতে মুদ্রিত ও বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত।

কৰ্ম্মযোগ

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রশঙ্কর দাশগুপ্তের সৌজন্যে

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস, কলিকাতা

কালি-কলম

১ম বর্ষ] মাঘ, ১৩৩৩ [১০ম সংখ্যা

গান

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নূপুর বেজে যায় রিনি রিনি
আমার মন কয় চিনি চিনি।
গন্ধ রেখে যায় মধু বায়ে
মাধবী বিতানের ছায়ে ছায়ে
ধরণী শিহরয় পায়ে পায়ে
কলসে কঙ্কনে কিনি কিনি।
পারুল শুধাইল কে তুমি গো
অজানা কাননের মায়া মৃগ।
কামিনী ফুলকুল বরষিছে
পবন এলোচুল পরশিছে
আঁধারে তারাগুলি হরষিছে
ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনি ঝিনি।

দিনের বেলায় বাঁশী তোমার বাজিয়েছিলে
অনেক সুরে।
গানের পরশ প্রাণে এলো
আপনি তুমি রইলে দূরে।
শুধাই যত পথের লোকে
এই বাঁশীটি বাজালো কে
নানান্ নামে ভোলায় তারা
নানান্ নামে বেড়াই ঘুরে।
এখন আকাশ ম্লান হ'ল
ক্লান্ত দিবা চক্ষু বোঁজে
পথে পথে ফেরাও যদি
মরব তবে মিথ্যা খোঁজে।
বাহির ছেড়ে ভিতরেতে
আপনি লহ আসন পেতে
তোমার বাঁশী বাজাও আসি
আমার প্রাণের অন্তঃপুরে॥

আধেক ঘুমে নয়ন চুমে
স্বপন দিয়ে যায়
শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে
পরশে মৃদুবায়।
বনের ছায়া মনের সাথী
বাসনা নাহি কিছু
পথের ধারে আসন পাতি
না চাহি ফিরে পিছু
বেণুর পাতা মিশায় গাথা
নীরব ভাবনায়।

মেঘের খেলা গগন-তটে
অলস লিপি লিখা
সুদূর কোন স্মরণ-পটে
জাগিল মরীচিকা,
চৈত্র দিনে তপ্তবেলা
তৃণ আঁচল পেতে
শূন্যতলে গন্ধভেলা
ভাসায় বাতাসেতে
কপোত ডাকে মধুক শাখে
বিজন বেদনায়।

—পাগলা ঝোরা

কর্ম্মযোগ

শ্রী অরবিন্দ ঘোষ

আমরা বলিয়াছি কর্ম্মযোগ হইতেছে জীবনে বেদান্ত ও যোগের প্রয়োগ। হিন্দুধর্ম্মের সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, তাঁহারা অনেকে আমাদের এই কথায় সন্দেহ করিতে পারেন। যাঁহারা "করিত্ কর্ম্মা" লোক তাঁহারা সাধারণতঃ বিবেচনা করেন যে বেদান্তকে জীবন-যাত্রার দিশারী করিয়া চলা আর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য যোগের আশ্রয় গ্রহণ করা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক জিনিষ; কারণ, তাহাতে মানুষ কর্ম্মের পথ ভুলিয়া গিয়া পড়ে নিরাকার তত্ত্বের জগতে। অবশ্য তত্ত্বমাত্রকেই যাঁহারা "মিস্‌টিসিজম্", আত্ম-প্রবঞ্চনা, শঠতা প্রভৃতি নাম দিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন কথা নাই। তবে আবার দেখা যায় এমন লোকও আছেন যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের মহত্ত্বে আস্থাবান শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেও, মনে মনে এই ধারণা পোষণ করেন যে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিতে হইলে মানব জীবনের পূর্ণ কর্ম্মব্যাপার হইতে কিছু দূরে থাকিতেই হইবে। কিন্তু সত্যকথা এই, যে মানুষ মানুষের সাধারণ জীবনই যাপন করে—যোগ-শক্তির সহায়ে ও বেদান্তের বিধান বা ধর্ম্ম অনুসারে—তাহার মধ্যেই আধ্যাত্মিক জীবন পরিপূর্ণ প্রতিভায় বিকশিত হইয়া উঠে। ভিতরের জীবন ও বাহিরের জীবনে এই রকম একটা মিলন-সূত্রকে ধরিয়াই মানবজাতি আপন দিব্য শক্তি, ভাগবত সত্তার মধ্যে পরিশেষে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। বেদান্ত জীবন-যাত্রায় কোন অনুপ্রেরণা দিতেছে না, ব্যবহারিক কর্ত্তব্যের বিধান দিতেছে না, তাহা শুধু তত্ত্ববিচারে ও নৈষ্কর্ম্ম্যে পর্য্যবসিত—এরূপ মনে করা ভুল। বরং কর্ম্মজীবনের সর্ব্ব-

শ্রেষ্ঠ যে নীতি মানুষের অধিকারে আসিতে পারে তাহার নির্দ্দোষ প্রতিষ্ঠা, তাহার পূর্ণ সমর্থন পাই গীতা ও উপনিষদের শিক্ষায়। গীতার বিশেষ শিক্ষা ঠিক সেইগুলিই যেগুলি দিতেছে জীবন-যাত্রার বিধান, একটা ধর্ম্ম ; আর বেদান্ত-সাধনার চরম লক্ষ্য যত অতিলৌকিকই হউক না কেন, তাহার জন্ম আয়োজন এই জীবনের মধ্যেই আগে দরকার—জীবনের ভিতর দিয়া চলিয়াই তবে মানুষকে অমৃতত্ব লাভ করিতে হইবে। অন্য মতটি আমাদের মধ্যে দেখা দেয় তখনই যখন কতকগুলি বিশেষ ভাব ও বিশেষ প্রেরণা দেশের ইতিহাসের বিশেষ একটা যুগে প্রবল ও বিপুল হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের ধর্ম্মের শেষ লক্ষ্য জড়-প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তি, ব্যক্তিগত পুনর্জ্জন্ম হইতে মুক্তি। এই সব-শেষের চূড়ান্ত শান্তি ও শুদ্ধি আমাদের দেশের কয়েকজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহা-পুরুষকে এমন প্রবল ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল যে তাঁহারা জীবনের ক্ষেত্র হইতে, সকল প্রকার শারীরিক কার্য্যকলাপ হইতে, আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারা চাহিয়া-ছিলেন যত সহজে ও যত শীঘ্র লক্ষ্যে গিয়া পৌঁছান যায়। তুঙ্গ পর্ব্বত-শৃঙ্গের মত তাঁহারা সাধারণ জীবনের সমতল ক্ষেত্রের উপর দাঁড়াইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের এই বৈরাগ্যকেই হিন্দুর সর্ব্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়া গিয়াছেন। ঠিক এই হেতু, শ্রীকৃষ্ণ এত জোর দিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে পূর্ণযোগী সিদ্ধ পুরুষকে জীবন হইতে কর্ম্ম হইতে অবসর লইলে চলিবে না—এ সকলের আর কোন প্রয়োজন না থাকিলেও, "লোক-সংগ্রহের" জন্য কর্ম্ম-জীবন তাঁহাদিগকে ধরিয়া থাকিতে হইবে। সাধারণ লোকে শ্রেষ্ঠ-দেরই অনুসরণ করিয়া চলে—শ্রেষ্ঠরা কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে দেখিয়া সাধারণও যদি স্ব-স্ব-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া বসে তবে সমাজে হয় বর্ণসঙ্করের বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব। আদর্শ যোগীর শক্তি কেবল অন্তর্মুখী, স্তম্ভিত হইয়া থাকে না ; তাহা জীবের কল্যাণে সর্ব্বদা নিযুক্ত—হয় তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পৃথিবীর উপর প্রবাহিত হয় ভাগবত শক্তির একটা বিপুল বন্যা, অথবা তিনি নিজেই নেতা হইয়া সম্মুখে দাঁড়ান, মানব জাতিকে কর্ম্মক্ষেত্রের সংগ্রামের ভিতর দিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চলেন ; কিন্তু এসব করিলেও কর্ম্ম তাঁহাকে কখন বাঁধিয়া রাখে না, আপন বিশেষ ব্যক্তিত্বকে ছাড়াইয়া তিনি সর্ব্বদাই প্রতিষ্ঠিত একটা বৃহত্তর সত্তায়।

তারপর 'বেদান্ত' কথাটি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় একটা সঙ্কীর্ণ অর্থে। শঙ্করের সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যপূর্ণ বুদ্ধি যে বিশেষ অদ্বৈতবাদ, যে নিজস্ব মায়াবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহাকেই আমরা সচরাচর বেদান্ত নাম দিয়া থাকি। কিন্তু বস্তুতঃ বেদান্তের একমাত্র প্রামাণ্য শাস্ত্র হইতেছে উপনিষদ, শঙ্করের গ্রন্থ নয়,—মূল, কিন্তু টীকা টিপ্পনী নয়। শঙ্করের ভাষ্য এক দিক দিয়া খুবই উঁচুদরের, খুবই যুগোপযোগী ছিল ; কিন্তু তবুও তাহা হইতেছে উপনিষদের অনেক ব্যাখ্যার অনেক মীমাংসার একটা ব্যাখ্যা, একটি মীমাংসা মাত্র। অতীতে এই ব্যাখ্যা, সব মীমাংসাই দেশের মনের উপর গভীর প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে ; ভবিষ্যতে যে আরও সুষ্ঠু একটা মীমাংসা হইবে না, তাহাও

কেহ বলিতে পারে না। এই ধরণের একটা মীমাংসাকেই রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শিক্ষা গড়িয়া তুলিতেছিল—তাহা চাহিয়াছিল সারা জীবনকে, সকল কর্ম্মকে আপন অঙ্গীভূত করিয়া লইতে। যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল, যখন তাঁহার দর্শন ও সদাচারে আর্য্যেরা দীক্ষিত হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময়ে ভারতে একবার যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তদ্রূপ দ্রুত না হইলেও তদপেক্ষা বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিপুলতর উদ্দেশ্য লইয়া ঠিক সেই রকমেরই একটি ব্যাপারের সূচনা আজ আবার সুরু হইয়াছে। সে-দিনের মতনই আজ এক মহাপুরুষ আসিয়াছিলেন—তাঁহাকে বিভূতিই বল আর অবতারই বল, নামে কিছু আসে যায় না; তিনি ছিলেন মানব আধারে ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ, ভাগবত শক্তির বিপুল একটা প্রবাহ লইয়া তিনি মানুষের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদের দৈনন্দিন জীবন ও কর্ম্ম পূর্ণ আধ্যাত্মিকতার শক্তি ও প্রেরণায় ভরিয়া দিয়াছিলেন। তবে সেবার ছিল অংশ—হয় ত উত্তম অংশ, তবুও অংশ মাত্র; এবার কিন্তু পূর্ণ জ্যোতি। বৌদ্ধ ধর্ম্ম বেদান্তের ব্যবহার শিক্ষা দিয়াছিল বটে কিন্তু বেদান্তের যে মূল সত্যটি তাহা সে অস্বীকার করিয়াছে—তাই যে দেশে তাহার জন্ম, যে দেশ ছিল তাহার রাজ-পাট ঠিক সেখান হইতেই শেষে তাহাকে বিতাড়িত হইতে হইল। বাহ্য ফলের দিক দিয়া দেখিলে, তখনও যাহা ঘটিয়াছিল এখনও তাহাই ঘটিবে—একটা বিরাট রাজনীতিক, সামাজিক ও মানসিক বিপ্লবের ফলে ভারত জগতের গুরু হইয়া দাঁড়াইবে, দেশে দেশে জ্ঞানের আলো বিতরণ করিবে, এমন সব ভাবের ও প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিবে যাহা যুগ যুগান্তর ধরিয়া জীবন্ত শক্তি লইয়া বর্ত্তিয়া থাকিবে। ইতিমধ্যেই ত দেখিতেছি বেদান্ত ও যোগের শিক্ষা এসিয়ার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে, ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যবহারিক জীবন ও কর্ম্মের ধারা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিতে সুরু করিয়াছে। পাশ্চাত্যের মনে প্রাচ্যের এই প্রভাব অনেক দিন ধরিয়াই নানা গৌণ উপায়ে বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে—কিন্তু সে সব যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারা, মাটির নীচে গুপ্ত স্রোত; জগৎ অপেক্ষা করিতেছে কবে ভারত মন্দাকিনীর পূর্ণ বন্যা মাথায় করিয়া আসিবে, বিশ্বমানবকে যাহাতে অবগাহন করাইয়া শুদ্ধ করিয়া তুলিবে।

যোগ হইতেছে ভগবানের সহিত সংযোগ; তাহার উদ্দেশ্য জ্ঞান, ভক্তি বা কর্ম্ম। মানুষের অন্তরে ও বাহিরে রহিয়াছে যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান সত্তা, তাহার সহিত যোগী সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছেন। অনন্তের সহিত তিনি এক সুরে বাঁধা, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া কোথাও তাঁহার শান্ত কল্যাণেচ্ছার ভিতর দিয়া, কোথাও বা তাঁহার জাগ্রত কল্যাণ-কর্ম্মের ভিতর দিয়া ভাগবত শক্তি পৃথিবীর উপর আপনাকে ঢালিয়া দেয়। মানুষ যখন অহংকারের খোলসটি ফেলিয়া দিয়া উপরে উঠে, পরের জন্য জীবন ধারণ করে, পরের সুখে দুঃখে নিজের সুখ দুঃখ অনুভব করে; যখন সে ভক্তিভরে, নিষ্ঠা সহকারে, নির্দ্দোষভাবে কর্ম্ম করে, অথচ ফলের জন্য ভাবনা-চিন্তা বিসর্জ্জন দেয়, জয়ের আশায় উদ্‌গ্রীব হয় না কি পরাজয়ের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয় না; যখন সে যাহা কিছু কর্ম্ম সকলই ভগবানের জন্য করে, প্রত্যেক চিন্তা

প্রত্যেক বাক্য প্রত্যেক কার্য্য ভাগবত পদমূলে নিবেদন করে; যখন সে দ্বেষ ও ভয়, আসক্তি ও বিরক্তি হইতে মুক্ত হইয়া প্রাকৃতিক শক্তির মতনই অচঞ্চল অশ্রান্ত অবাধ ও অব্যর্থভাবে কাজ করিয়া চলে; যখন সে নিজেকে শরীরের বা প্রাণের বা মনের বা এই তিনের সমষ্টির সহিত এক করিয়া ভাবে না, দেখিতে পায় নিজের সত্যকার নিজস্ব; যখন সে নিজের অমৃতত্ব ও মৃত্যুর অসত্যতা উপলব্ধি করে; যখন সে অনুভব করে, জ্ঞান নামিয়া আসিতেছে, নিজে যন্ত্র মাত্র, তাহার মন, তাহার বাক্য, তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাম, তাহার সকল অঙ্গের ভিতর দিয়া ভাগবত শক্তি অবাধে কাজ করিয়া চলিয়াছে; এই ভাবে মানুষ যখন তাহার যাহা কিছু আছে, সে যাহা কিছু করে এবং নিজের যাহা কিছু সমস্তই—সকলের প্রভু, মানবজাতির সখা ও সহায় যিনি তাঁহাকে অর্পণ করিয়া তাঁহারই মধ্যে নিত্যবাস করে, এবং দুঃখ দুশ্চিন্তা চাঞ্চল্য হইতে মুক্তিলাভ করে,—তখনই তাহার নাম যোগ। আসন-প্রাণায়াম, ধ্যান-ধারণা, পূজা-আচার নিজেরা কিছু যোগ নয়, যোগের উপায় মাত্র। আবার যোগ যে একটা কঠিন বা বিপজ্জনক পথ, তাহাও নয়; অন্তরের দিশারী ও গুরু যিনি তাঁহার শরণ লওয়া সকলেরই পক্ষে সুসাধ্য ও মঙ্গলকর। এ বস্তুতে অধিকার সকল মানুষেরই আছে। কারণ এমন মানুষ কেহ নাই যাহার প্রকৃতিতে শক্তি শ্রদ্ধা বা ভক্তি ব্যক্তভাবে না হউক, অন্ততঃ গুপ্তভাবে না রহিয়াছে—এই তিনটি বৃত্তির শুধু একটিমাত্রও যোগের অধিকারী হইবার পক্ষে যথেষ্ট। সকলে অবশ্য এক জীবনের মধ্যেই এই পথের চরমে পৌঁছিতে পারে না, কিন্তু কিছু না কিছু দূর সকলেই অগ্রসর হইতে পারে। আর যে পরিমাণে মানুষ অগ্রসর হয় সেই পরিমাণেই সে শান্তি শক্তি আনন্দ লাভ করে। এমন কি, এই ধর্ম্মের সামান্য একটুখানিও একটা মানুষকে একটা জাতিকে মহৎভীতি হইতে ত্রাণ করে—

স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

আমরা আবার বলি, জীবনীধারা হইতে আধ্যাত্মিকতাকে একটা বিচ্ছিন্ন পৃথক বস্তু মনে করা ভুল। ঈশ উপনিষদের কথা, "সব ত্যাগ কর, তবে সবই ভোগ করিতে পারিবে, অন্য কাহারও বিত্তে লোভও আবার করিও না। জগতে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াই তুমি তোমার শতবর্ষের জীবন যাপন করিতে বাঞ্ছা করিবে; তোমার কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের আর কোন উপায়ই তোমার নাই।" এই জগতের যত সংঘর্ষ তাহাকে অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে রহিয়াছে ধর্ম্মের চূড়া—এ রকম মনে করা মহা ভুল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বার বার ডাকিয়া বলিয়াছেন, এই সংঘর্ষে লিপ্ত হইবার জন্য। "যুদ্ধ কর, শত্রুর ধ্বংস-সাধন কর!" "আমাকে স্মরণে রাখ আর যুদ্ধ কর!" "তোমার সকল কর্ম্ম আমাকে নিবেদন কর, হৃদয় আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ করিয়া, সকল আকাঙ্ক্ষা হইতে, সকল অহংকার হইতে মুক্ত হইয়া কর যুদ্ধ! অন্তর হইতে তোমার জ্বরের আবেশ দূর হউক।" আমরা মনে করি যে ধার্ম্মিক মানুষ যদিই বা সাধারণ কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন, তবুও তিনি এমন সাত্ত্বিক, সাধু, দয়ালু, নরম, প্রকৃতির

হইয়া পড়েন যে সংসারের রূঢ় কর্ম্ম সব তাঁহার দ্বারা সম্ভব হয় না। কিন্তু এ ধারণাও ভুল। ইহার চূড়ান্ত বিপরীত কথা গীতা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন সন্দেহ কোন দ্বিধার অবকাশ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই—"যাহার প্রকৃতি গিয়াছে, নিজের কান ছায়া পড়িতে হত্যা করে, তবুও সে হত্যাকারী নয়, তবুও সে মুক্ত।" ধ্বংস-ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের উপর দিয়া পার্থসারথী রথ চালাইয়া দিয়াছেন—কর্ম্মযোগের ইহা জ্বলন্ত আলেখ্য। শরীর হইতেছে রথ, ইন্দ্রিয় সকল হইতেছে ধাবমান অশ্ব, আর জাগতিক কর্ম্মধারার রক্তাক্ত কর্দ্দমাক্ত পথ বাহিয়া বৈকুণ্ঠে লইয়া চলিয়াছেন মানুষের অন্তরাত্মাকে শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদক—শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত

সিন্ধু

তৃতীয় তরঙ্গ

নজরুল ইস্‌লাম

হে ক্ষুধিত বন্ধু মোর, তৃষিত জলধি।
এত জল বুকে তব, তবু নাহি তৃষার অবধি।
এত নদী উপনদী তব পদে করে আত্মদান,
বুভুক্ষু! তবু কি তব ভরিল না প্রাণ?
দুরন্ত গো, মহাবাহু
ওগো রাহু,
তিন ভাগ গ্রাসিয়াছ—এক ভাগ বাকী!
সুরা নাই—পাত্র হাতে কাঁপিতেছে সাকী!

হে দুর্গম! খোলো খোলো খোলো দ্বার।
সারি সারি গিরি দরী দাঁড়ায়ে দুয়ারে করে প্রতীক্ষা তোমার।
শস্য-শ্যামা বসুমতী ফুলে ফলে ভরিয়া অঞ্জলি
করিছে বন্দনা তব, বলী!

তুমি আছ নিয়া নিজ দুরন্ত কল্লোল
আপনাতে আপনি বিভোল।
পশে না শ্রবণে তব ধরণীর শত দুঃখ গীত ;
দেখিতেছ বর্ত্তমান, দেখেছ অতীত,
দেখিবে সুদূর ভবিষ্যৎ—
মৃত্যুজয়ী দ্রষ্টা, ঋষি, উদাসীনবৎ।
ওঠে ভাঙে তব বুকে তরঙ্গের মত
জন্ম মৃত্যু দুঃখ সুখ, ভূমানন্দে হেরিছ সতত।

হে পবিত্র! আজিও সুন্দর ধরা আজিও অম্লান
সদ্য-ফোটা পুষ্পসম তোমাতে করিয়া নিতি স্নান।
জগতের যত পাপ গ্লানি
হে দরদী, নিঃশেষে মুছিয়া লয় তব স্নেহ-পানি।
ধরা তব আদরিণী মেয়ে,
তাহারে দেখিতে তুমি আস মেঘ বেয়ে।
হেসে ওঠে তৃণে শস্যে দুলালী তোমার,
কালো চোখ বেয়ে ঝরে হিমকণা আনন্দাশ্রু ভার!
জলধারা হয়ে নাম, দাও কত রঙীন যৌতুক,
ভাঙ গড় দোলা দাও,—
কন্যারে লইয়া তব অনন্ত কৌতুক।
হে বিরাট নাই তব ক্ষয়,
নিত্য নব নব দানে ক্ষয়েরে করেছ তুমি জয়!

হে সুন্দর! জল-বাহু দিয়া
ধরণীর কটিতট আছ আঁকড়িয়া
ইন্দ্রনীলকান্তমণি মেখলার সম,
মেদিনীর নিতম্ব-দোলার সাথে দোল অনুপম।

বন্ধু, তব অনন্ত যৌবন
তরঙ্গে ফেনায়ে ওঠে সুরার মতন।

* কত মৎস্য-কুমারীরা নিত্য তোমা যাচে
কত জল-দেবীদের শুক্তমালা পড়ে তব চরণের কাছে,
চেয়ে নাহি দেখ, উদাসীন !
কার যেন স্বপ্নে তুমি মত্ত নিশিদিন !

মন্থন মন্দার দিয়া দস্যু সুরাসুর
মথিয়া লুণ্ঠিয়া গেছে তব রত্ন-পুর,
হরিয়াছে উচ্চৈঃশ্রবা, তব লক্ষ্মী, তব শশী-প্রিয়া,
তারা সব আছে আজ সুখে স্বর্গে গিয়া !
করেছে লুণ্ঠন
তোমার অমৃত সুধা—তোমার জীবন !

সব গেছে, আছে শুধু ক্রন্দন-কল্লোল,
আছে জ্বালা, আছে স্মৃতি, ব্যথা উতরোল !
ঊর্দ্ধে শূন্য,—নিম্নে শূন্য,—শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার, সীমাহীন রিক্ত হাহাকার !

হে মহান ! হে চির-বিরহী !
হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর, হে মোর বিদ্রোহী,
সুন্দর আমার !
নমস্কার !
নমস্কার লহ !
তুমি কাঁদ,—আমি কাঁদি,—কাঁদে মোর প্রিয়া অহরহ !

হে দুস্তর ! আছে তব পার, আছে কূল,
এ অনন্ত বিরহের নাহি পার নাহি কূল, শুধু স্বপ্ন ভুল !
মাগিব বিদায় যবে, নাহি রব আর,
তব কল্লোলের মাঝে বাজে যেন ক্রন্দন আমার !
বৃথাই খুঁজিবে যবে প্রিয়া
উত্তরিও বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর, তুমি গরজিয়া !
তুমি শূন্য, আমি শূন্য, শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার, সীমাহীন রিক্ত হাহাকার !

চট্টগ্রাম, ২-৮-২৬

চুন্ চুন্ সএ হমারে মরী ঐ—

শ্রী জগদীশ গুপ্ত

চিরদিনই এমন ছিল না—

মা, স্ত্রী ও তিন্‌টি দুগ্ধবতী গাভী লইয়া পল্লীপ্রান্তে শিবপ্রিয় সুখেই ছিল।

মা পোয়াতিদের কাঁথা শেলাই করিয়া দেয়; আজুরা বার আনা, একটাকা, আঠার আনা; ঘর লেপিয়া, ঘুঁটে দিয়া দেয়, দুইবেলা খাইতে পায়। স্ত্রী নিত্য গৃহস্থের ধান ভানিয়া দেয়—বিশ্ সেরে দু'সের তার পারিশ্রমিক। ······তিনজনে প্রাণপণে গরু তিনটির সেবা করে; তারাই লক্ষ্মী। দুধ লইয়া শিবপ্রিয় বাজারে বেচিয়া আসে; খড়, ভুঁষি, ঘাস, বাগান-কুড়ান জ্বালানি কাঠ অদূরের টাউনে লইয়া বেচে।·········· ····

এম্‌নি করিয়া তিল কুড়াইয়া তারা তাল করে।

দিন চলে।

পথের দিকে চাহিয়া কি দেখিয়া শিব মুখ টিপিয়া হাসে।······নিত্য তার নিটোল দেহ দুলাইয়া কল্‌সীকাঁখে জল আনে; জলের কল্‌সী দাওয়ায় নামাইয়া হাঁফ্ ছাড়ে; কাঁখালের সিক্ত স্থানটায় কাপড়ের ভিতর দিয়া ত্বকের কাঞ্চন আভা ফুটিয়া ওঠে—

সেইদিকে একবার অলক্ষ্যে চাহিয়া লইয়া শিব বলে,—আছি বেশ।

নিত্য বলে,—নিত্যিইত শুনি; এখন, অদেষ্টে টিঁকলে বাঁচি।

টিক্ টিক্ করিয়া টিক্‌টিকি ডাকে।

—বরাত্। বলিয়া শিব বলে,—দোনাটা কই? আজ দুধ আর বাজারে নেব না, নিত্য।' খাব।'

—মা কই?

—কোন্ বাড়ী কাঁথা দিতে গেল।

নিত্য দোনাটি আগাইয়া দেয়, কিন্তু শিবপ্রিয়র গরু দোহাইবার গরজ দেখা যায় না।—

নিত্য চৌকাঠে জলের ছিটা দিয়া ঘরে ঘরে তুলসীতলায় সন্ধ্যা দেখাইয়া ফেরে, তার অতুলন গঠনসুষমার দিকে চাহিয়া শিবপ্রিয়র কেমন নেশা ধরিয়া যায়; মুহুর্মুহুঃ দুজনার চোখোচোখি হয়, মুহুর্মুহুঃ হাসি ফুটিয়া মুখময় ছড়াইয়া পড়ে।

নিত্য তাগিদ্ দেয়,—নেও, ওঠো, সন্ধ্যে যে বয়ে গেল, গরু দুইতে হবে না নাকি আজ?

—সে হবে'খন্। বলিয়া শিব নির্জ্জীবের মত বসিয়া থাকে। বলে,—আছি বেশ।

নিত্য হাতের প্রদীপটি তুলিয়া ধরিয়া উঠানের মাঝখানেই দাঁড়াইয়া পড়ে; হাসিয়া বলে,—কে নেই শুনি?

—অটল নাপিত নেই, জগাই ঘোষ নেই, সুদাম পাল নেই। আর বল্‌ব? তাদের বৌ—

প্রদীপটি হঠাৎ টানিয়া লইয়া নিত্য চলিয়া যায়, মনে মনেই ঠোঁট্ ফুলাইয়া বলে,—বৌ সুন্দর, সেই গরবেই দিনরাত আটখানা।·········

দিন চলে।

হঠাৎ একদিন "বম্ মহাদেও" বলিয়া "বিরাশী দশ আনা" ওজনের এক হাঁক্ ছাড়িয়া সশিষ্যে এক সন্ন্যাসী সেনেদের পুকুর পাড়ে আসিয়া লিচু গাছের নীচে আড্ডা জমাইয়া বসিলেন।

এক নিমেষেই যারা সাধুর পদপ্রান্তে ভিড়িয়া গেল শিবপ্রিয় তাহাদের অন্যতম। সন্ন্যাসীর খড়মের বোলে' হইতে সুরু করিয়া চূড়া করিয়া বাঁধা ঐ জটাদাম পর্য্যন্ত

সবই অপার্থিব, এবং উহাদেরই কোথাও ঐহিক সিদ্ধি এবং পারত্রিক মোক্ষ বিতরণ করিবার জন্যই একত্র করিয়া রাখা আছে এই বিশ্বাস যে কেমন করিয়া গ্রামস্থ পুণ্য ও ত্রাণলুব্ধ ব্যক্তিগুলির জ্ঞানজগতে বদ্ধমূল হইয়া গেল সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য সেইটাই।

একটা অত্যন্ত কৃশ চুলওঠা লোক কোঁচার খুঁটটি গায়ে জড়াইয়া সন্তর্পণে দূরে দাঁড়াইয়া ছিল ;—চারিদিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহাকেই "মনোনীত" করিয়া আঙ্গুলের ইসারায় কাছে ডাকিয়া লইলেন।..... সে প্লীহার ঔষধের সন্ধানে আসিয়াছিল, ভয়ে ভয়ে নিকটস্থ হইতেই সন্ন্যাসী তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন—

প্লীহার রোগী অতিশয় ভক্তিভরে সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাহার গায়ের কাপড় সরিয়া পেট বাহির হইয়া পড়িল ; তাহার প্লীহার স্থানটিতে চিতার কষ দিয়া বীভৎস একখানা ক্ষত করা হইয়াছে ; সেইদিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন,—আমরা তোদের গাঁয়ের অতিথি, আমাদের খাওয়া।

শুনিয়া জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

—ও বড় গরীব, বাবা ; কি সেবা হবে হুকুম করুন, আমরাই—

বলিয়া সকলে সসম্ভ্রমে হাত জুড়িয়া দাঁড়াইয়া রহিল।—

সাধু তখন তাঁর খাদ্যোপকরণের এমন দীর্ঘ এবং মহার্ঘ্য এক ফর্দ্দ দিলেন যে তিনি জীবন্ত স্বর্ণমৃগের মাংস চাহিয়া বসিলেও দরিদ্র গ্রামবাসীরা ইহার বেশী বিব্রত হইয়া পড়িত না।......ফর্দ্দের এ-পিঠে দাঁড়াইয়া জনতা দেখিল, সন্ন্যাসী তাঁহার জটাজালসহ যেন আরও দুরতিক্রম্য হইয়া উঠিয়াছেন।—

লোকগুলির নিঃশব্দ শুষ্কমুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—আমি এম্‌নিই রোজ খাই। টাকা? আচ্ছা, টাকা আমিই দিচ্ছি। একজোড়া নতুন সরা আর কিছু ঘুঁটে আমায় এনে দে তোরা।

নূতন সরা এবং ঘুঁটে আসিল।

সন্ন্যাসী কোথা হইতে দুইটি শিশি বাহির করিয়া একটির ছিপি খুলিয়া সরার মধ্যে ঢালিলেন খানিকটা কাঁচা পারা ; তারপর বলিলেন,—এটা সুলেমানী নিমক্। বলিয়া দ্বিতীয় শিশি হইতে খানিকটা "সুলেমানী নিমক্" সেই পারার মধ্যে ঢালিয়া দিতেই পারা জমিয়া কঠিন হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বলিলেন,—জ্বাল্ ঘুঁটে।

জ্বালা হইল—

সন্ন্যাসী দ্বিতীয় সরাটি দিয়া প্রথম সরাটি আবৃত করিয়া আগুনের উপর তুলিয়া দিলেন।—

জনতা নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া সেই অদ্ভুত প্রক্রিয়া দেখিতে লাগিল।............

মিনিট পনর' পরে সরা সরাইয়া আনিয়া আবরণ তুলিয়া ফেলিতেই দেখা গেল, পারা এবং "সুলেমানী নিমক্" আগুনের উত্তাপে মিশিয়া খানিকটা সিঁন্দুর রঙের গুঁড়া প্রস্তুত হইয়াছে—

সন্ন্যাসী বলিলেন—এ স্বর্ণচূর্ণ। স্যাকরার দোকানে নিয়ে যা, গলে জমে গেলেই খাঁটি সোনা হবে।

সত্যই সোনা।

তেরটাকা সাড়ে পাঁচ আনায় সেই সোনা বিক্রয় হইল।......সন্ন্যাসী সশিষ্য প্রচুর ভোজন করিলেন, এবং তাঁহার "সেবার" পর সমাগত আশুভক্তগণ যাহা প্রসাদ পাইল তাহাও প্রচুর।......

শিবপ্রিয়র চোখে সে-রাত্রে ঘুম আসিল না।

আসিবার কথাও নয়।

অতন্দ্র চোখে শিবপ্রিয় ভাবিতে লাগিল,—কিসের বিনিময়ে সন্ন্যাসী এই সোনা প্রস্তুত করিবার প্রণালীটা শিখাইয়া দেয়!—একখানা হাত, একখানা পা, একটি চক্ষু,—সন্ন্যাসীর কথায় শিবপ্রিয় কাটিয়া উপড়াইয়া দিতে

পারে, যদি উহাদের একটিকেই সেই বিদ্যাদানের দক্ষিণা বলিয়া সে চাহে।..........একটা নিদারুণ তীব্র আশা বার বার তাহার মনে সত্য হইয়া উঠিয়া তাহাকে যেন শরবিদ্ধ করিয়া শয্যার উপর তুলিয়া তুলিয়া বসাইতে লাগিল......মন্ত্র হোক্, দ্রব্যগুণ হোক্, বাক্‌সিদ্ধি হোক্, —প্রভুর অশেষ কৃপায় যেন তাহা তাহার করায়ত্ত হইয়াছে.... অট্টালিকা, বৈভব কত!......নিত্য স্বর্ণ-মণ্ডিত সালঙ্কারা হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রতিমার মত হাসিতেছে।

—নিত্য ?

ঘুম ভাঙ্গিয়া নিত্য বলিল,—কি ?

—কিছু না। ভোর হতে আর কত দেরী ?

—জানিনে, দেখ। বলিয়া নিত্য আবার ঘুমাইয়া পড়িল।—

শিবপ্রিয় বুক বাঁধিল—

যেমন করিয়াই হউক্, প্রভুর নিকট হইতে এ-বিদ্যা আহরণ করিতেই হইবে।..............

তখনও ভাল করিয়া রাত পোহায় নাই—

শিবপ্রিয় যাইয়া দু'হাত দিয়া সন্ন্যাসীর পা জড়াইয়া ধরিল।

সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন,—কি বাবা ?

শিবপ্রিয় সন্ন্যাসীর পা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল,—বাবা, আমি বড় অনাথ, তোমার কৃপার ভিখারী।

প্রত্যুত্তরে সন্ন্যাসী বলিলেন,—কৃপার ভিখারী কে কার নয়, বাবা ? বেদান্তের সার মর্ম্মই ত এই যে, আত্মাই জগতের উপাদান, আত্মাই জগতের নিমিত্ত, আত্মাই ঈশ্বর; অতএব তুমিও ঈশ্বর, আমার প্রণম্য। আমিও তোমার কৃপার ভিখারী।

সন্ন্যাসীর এই উচ্চাঙ্গের বৈদান্তিক বিনয়ে শিবপ্রিয় শশব্যস্তে দাঁতে জিব্ কাটিয়া যেমন কুণ্ঠিত তেম্‌নি বিগলিত হইয়া গেল।

শিবপ্রিয়র সজল চক্ষুর দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী পুনশ্চ বলিলেন,—কিন্তু কথাটা কি ?

মুহূর্ত্তেক কণ্ঠহারা থাকিয়া শিবপ্রিয় হু হু করিয়া তাহার প্রার্থনা জানাইয়া গেল,—তুমি কি ক'রে কাল সোনা করলে, সেইটে আমায় শিখিয়ে দাও, বাবা।

সন্ন্যাসী একটু হাসিলেন,—সেটা বিতৃষ্ণা বিদ্রূপ কি তৃপ্তির হাসি তাহা বোঝা গেল না; কিন্তু সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া বলিলেন,—দেব। কিন্তু একটা কথা বাবা—

—আজ্ঞে করুন। বলিয়া শিবপ্রিয় হাঁটু তুলিয়া হাত জুড়িয়া বসিল।

শিবপ্রিয় ভাবিয়াছিল, সন্ন্যাসী বুঝি কি না কি চাহিয়া বসিবেন, কিন্তু তিনি যে প্রস্তাব করিলেন তাহা যেমন স্বাভাবিক তেম্‌নি সহজসাধ্য। বলিলেন,—আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমায় ছ'মাস থাক্‌তে হবে।—

এত সুলভ !—

শিবপ্রিয় আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিয়া পুনর্ব্বার সন্ন্যাসীর পা জড়াইয়া ধরিল; বলিল,—বাবা, তোমার অপার দয়া।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—ছ'মাস যেদিন পূর্ণ হবে সেইদিন..............

......ছ'মাসের প্রথম মুহূর্ত্তেই শিবপ্রিয়র অন্তরের দিক্ দিক্ দিয়া পরিপূর্ণতার আর কিছু বাকি রহিল না।......

রাত্রি তখন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে; পৃথিবী নিঃশব্দ। লতাগাছ বাড়িয়া একপায়া পথের উপর ঝাঁপাইয়া আসিয়া পড়িয়াছে; হন্ হন্ করিয়া চলিতে চলিতে তাহাতে পা বাধিয়া শিবপ্রিয় দাঁড়াইল—

কানে গেল, মাথার উপর বাঁশের ঝাড়ে বাদুড়ের ঝটাপটি, দূরে একটা পাখীর কর্কশকণ্ঠের আর্ত্তনাদ—কোয়াক্ কোয়াক্ কোয়াক্।..............

আবার সব নীরব।—

পৃথিবীর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা উল্লাস তৃপ্তি অতৃপ্তি ক্ষিপ্রতা

সুপ্তিসমুদ্রে ডুবিয়া গেছে, কেবল শিবপ্রিয়র বুকে জলিতেছে বিনিদ্র লালসা।—

শিবপ্রিয় গৃহত্যাগ করিয়াছে……… ……

পরিত্যক্ত গৃহে জননী নিদ্রিতা, নিত্য নিদ্রিতা—

সম্মুখে সুবর্ণের লোভ নিত্যকালের সমস্ত মোহ ছাপাইয়া দুটি ব্যগ্রবাহুর ইঙ্গিতে তাহাকে নিরুদ্দেশের দিকে প্রাণপণে ডাকিতেছে, তাহারই উগ্র উত্তাপে মায়া বুঝি বাষ্প হইয়া গেছে………………

তবু শিবপ্রিয় একবার চকিতে পিছন্ ফিরিয়া চাহিয়াই চলিতে সুরু করিল।……………

আজ পূর্ণিমা; ছ'মাস পরে আর এক পূর্ণিমায় তার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

সন্ন্যাসী প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন—

শিবপ্রিয় "আশ্রমে" যাইয়া উপনীত হইতেই যাত্রা করিলেন।

পথের আর শেষ নাই…………

শিবপ্রিয় জিজ্ঞাসা করে,—আমরা কোথায় চলেছি বাবা?

বাবা গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া যান,—গোকর্ণ, রামেশ্বর, মধ্যার্জ্জুন, বদরিকা, কেদার, পুণ্ডরীকপুর, কালহস্তীশ্বর—

শিবপ্রিয় চুপ করিয়া ভাবে, না জানি ইহারা কোথায়!

চিরদিন পল্লীর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকিয়া শিবপ্রিয়র অন্তর ছিল শিশুর মত কুতূহলী; কিন্তু বাহিরের সমগ্র অখণ্ডতা উপলব্ধি করিয়া মনের ভাণ্ডারে চির আনন্দের রসবিলাস সঞ্চিত করিয়া লইবার শক্তিও তার ছিল না।……………ক্ষণেক বিস্মিত হইয়া, ক্ষণেক ম্রিয়মাণ হইয়া, ক্ষণেক উৎফুল্ল হইয়া, ক্ষণেক অধীর হইয়া সে নীরবে সন্ন্যাসীর সঙ্গী হইয়া চলিয়াছে।—

সে কি সেবা!—

শিবপ্রিয় সাধুর পা ধুইয়া দেয়, ভাং বাটে, পা টিপিয়া দেয়, শয্যা রচনা করে। সন্ন্যাসীর মুখ দিয়া অকারণ এবং অবিরাম যে অশ্লীল শব্দগুলি নিঃসৃত হয় তাহা সে ভ্রূক্ষেপও করে না। কুকুরকুণ্ডলী হইয়া গাছের তলায় পড়িয়া থাকে—

আর দিন গোণে—

রাবণের চিতা নাকি অনির্ব্বাণ, কান ঢাকিলেই তার আগুনের সোঁ সোঁ শব্দ কানের ভিতর বাজিতে থাকে— তেম্‌নি করিয়া অনুক্ষণ জলে সুবর্ণের পিপাসা শিবপ্রিয়র বুকে।…………

ছ'মাস গেছে—

ছ'মাস পূর্ণ হইয়া আজ সেই নিরূপিত পূর্ণিমা।

বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে সন্ন্যাসীর "ক্যাম্প" পড়িয়াছে। সম্মুখে কিছুদূরেই শীর্ণা নদী—

ওপারে দিগন্তরাল হইতে চাঁদ উঠিতেছে।

দৌর্ব্বল্যের ভারে স্তিমিত নেত্রদু'টি একটু বড় করিয়া শিবপ্রিয় নিবেদন করিল,—বাবা, আজ ছ'মাস পূর্ণ হ'ল। সেবায় তোমায় তুষ্ট করতে পেরেছি কি না জানিনে।

হাত তুলিয়া সাধু বলিলেন,—হাঁ, হাঁ, আমার খেয়াল আছে। আমি তোমার সেবায় খুব খুসী হয়েছি। আজ তোমার বরলাভ হবে।

একজন শিষ্য বলিল,—আলবৎ হোবে।

শিবপ্রিয়র তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না, সাধু মিথ্যাভাষী নহেন; তবু কথাটা নূতন করিয়া সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়া তার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল।—

হুকুম হইল,—সরবৎ বানাও।

সরবৎ বানান হইল।

—নদী থেকে জল নিয়ে এস।

শিবপ্রিয় লোটা লইয়া জল আনিতে গেল।

অগ্নিকুণ্ড জলিতেছিল।

সন্ন্যাসী মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া লোটাভরতি সরবৎ চোখের

সম্মুখ হইতে নামাইয়া শিবপ্রিয়র হাতে দিলেন,—পিও।

শিবপ্রিয় ঢক্ ঢক্ করিয়া একচুমুকে একলোটা সরবৎ গলাধঃকরণ করিয়া তটস্থ হইয়া বসিয়া রহিল—

পুনরাদেশ কি হইবে কে জানে! কিন্তু আদেশ কিছু আসিল না—

সন্ন্যাসী নিমীলিত চক্ষে ছুলিয়া ছুলিয়া হরগৌর্য্যষ্টক্ গাহিতে লাগিলেন,—

কস্তুরিকাচন্দনলেপনায়ৈ,
শ্মশানভস্মাঙ্গ বিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥
মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ,
কপালমালা পরিশোভিতায়।
চ দিগম্বরায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥
চলৎ * * *

অষ্টকগীতির স্বর সুস্পষ্ট হইয়া সুরু হইয়া ক্রমশঃ একটানা গুঞ্জনের মত শিবপ্রিয়র কানে আসিতে আসিতে মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া একসময় বাতাসে মিলাইয়া গেল………………

শিবপ্রিয়র যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন উষাকাল, সূর্য্যোদয়ের বিলম্ব আছে।—কি উদ্দেশ্যে সে গৃহত্যাগ করিয়াছিল, কি কারণে সে এখানে, এই প্রান্তরে শুইয়া,—চোখ্ মেলিয়াই হঠাৎ তাহার কিছুই মনে পড়িল না; কিন্তু মনে যখন পড়িল তখনই এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল সংসারে যাহার উপমা নাই;—অন্তরের অতলতম স্থান হইতে সহসা একটা ভূকম্পনের তীব্র তরঙ্গ উত্থিত হইয়া তার প্রাণের গভীরতম মূল পর্য্যন্ত প্রচণ্ড আলোড়নে টলাইয়া সম্মুখের দিক্‌চিহ্ন যেন কিছুক্ষণের জন্য একেবারে বিলুপ্ত করিয়া রাখিয়া দিল। ……সে বিস্ময়েরও সীমা নাই, সে যন্ত্রণারও সীমা নাই।… উঠিয়া বসিয়া শিবপ্রিয় ক্লান্তচক্ষে চাহিয়া রহিল; দেখিল সশিষ্য ও সসম্পত্তি সেই সন্ন্যাসী কোথাও নাই; অর্দ্ধদগ্ধ একটা গাছের গুঁড়ি আর ভস্মের স্তূপ পড়িয়া আছে…… অসময়ের সম্বল বলিয়া যে কাঁচা টাকা দশটা সে ট্যাঁকে করিয়া আনিয়াছিল, তাহাও অস্তমিত পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গেই অন্তর্হিত হইয়াছে।

শিবপ্রিয় পা তুলিয়া ধীরে ধীরে ফিরিবার পথ ধরিল।—

দেখিলে হঠাৎ চেনা যায় না, উপবাসে অনিদ্রায় অর্দ্ধমৃত শিবপ্রিয় এম্‌নি চেহারা লইয়া ছ'মাস পরে যখন একদিন গৃহে পৌঁছিল তখন সূর্য্য ডুবু ডুবু।

মা বলিয়া ডাকিতেই বন্ধদুয়ার ঘরের ভিতর শুধু একটা লক্ষ্মীপ্যাঁচা বাতাসে ভারি পাখার ঝাপ্‌টা মারিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিল, আর কোনো সাড়া আসিল না।

—নিত্য?

নিত্য সেখানে ছিল না।

—মা?

ষোল সতর' বছরের একটা ছোঁড়া হারান' বাছুর খুঁজিতে সেইদিকে আসিয়াছিল; সে জঙ্গলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বলিল,—মা তোমার উই রায়েদের বাড়ী।

—সেখানে কি করে?

—জানিনে। বলিয়া ছোঁড়া আবার জঙ্গলে ঢুকিল।

—মা?

নিঃশব্দে মা আসিয়া রায়েদের পিছনবাড়ীর চালার খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল।—শিবপ্রিয় বড় আশ্চর্য্য অবাক্ হইয়া গেল—মা কথা কয় না কেন!—

—মা কথা কইছ না যে? বলিয়া শিবপ্রিয় নিত্যর সন্ধানে এদিক্ ওদিক্ চাহিতেই সেই চাহনির অর্থ বুঝিয়া

সহিষ্ণুতা ভাঙ্গিয়া মা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বসিয়া পড়িল।—

ভীত হইয়া শিবপ্রিয় বলিল,—কি হয়েছে বল না, মা?

—কোথায় ছিলি এতদিন? আমরা যে একেবারে ধনে-প্রাণে গেছি রে। বৌমা নেই।... ...

বলিয়া দক্ষ মাথা কুটিতে লাগিল। কিন্তু নিত্য নাই —এত বড় অতর্কিত আঘাতে শিবপ্রিয় যেন এক নিমেষেই অসাড় পাষাণ হইয়া গেল—

খুঁটিতে পিঠ্ দিয়া সে ঠায় বসিয়া রহিল, না আসিল চোখে তার একফোঁটা জল, না ফুটিল মুখে একটি কথা।

—কি হয়েছিল আগে সব বল তারপর আমি জল মুখে দেব। বলিয়া শিবপ্রিয় দীর্ঘ রুক্ষ কেশ দুই হাতে মুঠায় বাঁধিয়া পুনরায় স্তব্ধ হইয়া গেল।

দক্ষ বলিল,—অন্নকষ্ট পাইনি, বাবা, কোনোদিন। বলিয়া নতচক্ষে খানিক্ থামিয়া সে বলিতে লাগিল,—তুই যাবার সাতদিন পরে মাধব পাল একদিন হঠাৎ 'পিসি' বলে ডাক্ দিয়ে উঠনে এসে দাঁড়াল; বল্ল, শিবপ্রিয় ত নিরুদ্দেশ, তোমাদের চল্‌বে কি করে, পিসি? বললাম, ভগবান চালিয়ে নেবেন।...মাধব হেসে বললে,—ভগবান নিজে হাতে চালিয়ে নিচ্ছেন এমন ত' কখন দেখিনি।—তোমাদের কিছুর অভাব যদি কোনোদিন হয় তবে আমাকে জানিও, বুঝলে পিসি? আমাকে তোমাদের আপনার বলেই জেন।— বলে সে চলে' গেল।...মাত্র তিনদিন সে এসেছিল; একদিন খালি বৌমাকে হেসে ডেকেছিল, বৌদি। যেচে এসে দরদ জানিয়ে যাবার কি দরকার তার পড়েছিল তা' সেই জানে আর তার ধর্ম্ম জানেন। বৌমা তাকে মুখ দেখায়নি কোনোদিন একথা আমি মা হ'য়ে ডেকে বলছি বাবা। কিন্তু গাঁয়ে রটে' গেল বড় খারাপ কথা—

—কি কথা?

—সে কথা মুখে আন্‌তে ভয় করে; মঙ্গল হয়, সতীর শাপে মুখ খসে পড়বে। রটল—মাধব পাল বৌমাকে গয়না দিয়েছে, কাপড় দিয়েছে......কেউ দেখেছে হাস্‌তে, কেউ দেখেছে পান দিতে, কেউ দেখেছে আঁচল নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে,—

—তারপর?

—শুনে তার চোখের জল দিনরাত আর থামে না; ঘুরে ফিরে সে কেবলি তোর কথাই বলে, মা, সে এসে শুনে কি ভাববে, আমি এ মুখ তাকে দেখাব কেমন করে, এ মিথ্যে যে একেবারে মিথ্যে তা' আমি একা তাকে কেমন করে' বোঝাব?......বল্‌তে বল্‌তে সে চোখের জলে নেয়ে ওঠে।

একটু থামিয়া আবার সে বলিল,—দিনরাত তার চোখ দুটো ফুলো ফুলো আর টক্ টকে লাল—দেখে আমার ভয় করত। না ঘুমিয়ে আর উপোসে আর ভাব্‌নায় শুকিয়ে কাটির মত হ'য়ে উঠতে উঠতে—

কে জান্‌ত তার মনের কথা, জান্‌লে কি তাকে আমি এক দণ্ডও চোখের আড়াল করি?......

একদিন সে—বলিয়াই সে আবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।...একটু থামিয়া আবার বলিল,—পাড়া থেকে এসে দেখি, বৌমার ঘরের দোর ভেজান, ভেতরে যেন একটা হাঁসফাঁস্ শব্দ হচ্ছে, ঠেলা দিয়ে দরজা খুলেই দেখি, সাম্‌নে ঝুল্‌ছে; প্রাণটা তখনো সব বেরোয়নি; দড়ি কেটে নামিয়ে নিলাম, কিন্তু—

বলিয়া দক্ষ আবার মাথা কপাল কুটিতে লাগিল......মিথ্যে কলঙ্ক নিয়ে সে গেছে; মিথ্যে, শিব, একেবারে মিথ্যে।—

শিবপ্রিয় সহসা ছিট্‌কাইয়া খাড়া হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল—মা এস।

—কোথায়?

—টাউনে।

—সাম্‌নে যে রাত্তির।

—তা' হোক্। এ মাটি আর সইছে না, মা।

সেই হইতে শিবপ্রিয় ভিখারী—

মাথায় বড় বড় রুক্ষ চুল কাঁধ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া থাকে।

চুলের লাল্‌চে রংটা রৌদ্রালোকে ঝিক্‌ ঝিক্‌ করে। মহিষের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শিংটায় ফুৎকার দিয়া সে বাজায়। কাঠের সর্পিল লাঠিটা বগলে থাকে। গাল ফুলাইয়া তাহার উপর আঙুলের দ্রুত আঘাত দিয়া বাজায় বু—উ—উ; মুখে বলে ববম্‌ বম্‌। কাপড়ের রং লাল; গলায় রুদ্রাক্ষের মালা নাভি স্পর্শ করে; ললাট রঙের রেখায় দ্বিভক্ত করিয়া সিন্দুরের ত্রিশূল অঙ্কিত থাকে।—

ভিক্ষা মাগিয়া পথ চলিতে চলিতে সহসা সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি তুলিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে—

চুন্‌ চুন্‌ সএ হমারে মরী ঐ। *

লোকে বোঝে না, বলে,—পাগল।··

একটি বছর গেছে।

প্রত্যহ গভীর রাত্রে আসিয়া নিত্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা চাহিয়া যায়—

শিবপ্রিয় শয্যায় পড়িয়া কান পাতিয়া থাকে; আকাশে কোথায় নিত্যর কণ্ঠ ধ্বনিত হয়; তারই চোখের জল ফোঁটায় ফোঁটায় পড়িয়া বুঝি শিয়রের মাটি ভিজিয়া থাকে।· ····

দক্ষ একদিন অসুখে পড়িল; কিন্তু বেশী ক্লেশ সে দিল না; তিন দিনের দিনই বোঝা নামাইয়া দিল।

আবৃত শবদেহ স্পর্শ করিয়া শিবপ্রিয় হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া ছিল; মন তার আশ্রয়চ্যুত হইয়া হা হা করিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছিল।—নিত্যর অপমৃত্যুর স্মৃতি ত ভুলিবার নয়; নিত্য সেই নিদারুণ সতীধর্ম্মপালনের, সে যে আপন হাতে বৃন্ত ছিন্ন করিয়া গেছে সেই নিষ্ঠুরতম কথাটার সাক্ষী কেবল মা, আর তার নিজের অন্তরাত্মা।··· এই দুঃসহ উপলব্ধিটাই তার মনে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, মা মরিয়া আজ সে একেবারে একা—

নিত্যর বিরুদ্ধে সমস্ত জগত—

মা তাহাকে একান্ত নিঃসহায় নিঃসঙ্গ করিয়া সংসারের উত্তপ্ত এক প্রান্তে দাঁড় করাইয়া দিয়া গেছে—

নিত্যর পক্ষে সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে আজ সে একা—

সান্ত্বনা চাহিয়া মুখপানে চাহিবে এমন আর কেহ নাই। .....

মনে পড়িতে লাগিল, মা তাহাকে কি করিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল!—

শিবপ্রিয় বলিত,—আমি ছেলেবেলায় খুব কাঁদতাম, নয় মা?

মা বলিত,—কম জালিয়েছ তুমি আমাকে, এক একদিন—

—খুব গরীব ছিলাম নাকি আমরা?

মা কথা কহিত না।—দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে বুকে লইয়া সদ্যঃবিধবার সেই ভিক্ষা-জীবনের দিনগুলি মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দ্রুতবেগে উদ্ঘাটিত হইতে থাকিত।······

শিবপ্রিয় বলিত,—তুমি নিজে না খেয়ে, ভিক্ষে করে আমাকে খাইয়েছ, একথা সত্যি, মা?

মা হাসিয়া বলিত,—কে বললে তোকে?

—লোকেই বলে। বলিয়াই হঠাৎ সরিয়া আসিয়া শিবপ্রিয় মায়ের পায়ের ধূলা দু'হাতে করিয়া মাথায় লইত।···· ·

ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তার মনে হইল, মা বুঝি সাম্‌নেই বসিয়া আছে—

তাড়াতাড়ি চোখ তুলিতেই বস্ত্রাবৃত শবদেহ পার হইয়া তার দৃষ্টি যাহার উপর পড়িল সেটা একখানা অপরিচিত মুখ।—

জানালার জালিতে মুখ দিয়া কে একজন দাঁড়াইয়া ছিল, শিবপ্রিয়কে মুখ তুলিতে দেখিয়া সে সকৌতুকে প্রশ্ন করিল,—ওরে পাগলা, তোর মা মরেছে? ফেল্‌বি না রেখে দিবি?

শিবপ্রিয় বলিল,—লোক চাই যে, বাবা, ডেকে দাও না। আমরা—

* বাছিয়া বাছিয়া আমার শত্রু নিপাত কর।

—তা' দিচ্ছি, কিন্তু মাল চাইবে তারা। আছে ত?

—নেই ত।

—গঙ্গারাম।—বলিয়া সে চলিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরেই আরও চার জনকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া উঁকি মারিয়া কহিল,—পাগল্‌া, আছিস্ ত?

—আছি বাবা।

—নে, তবে ওঠ্। মাল আন্‌গে; আমরা মড়া আগ্‌লাচ্ছি। বলিতে বলিতে এক এক করিয়া পাঁচজন শ্মশান-বন্ধু ঘরে ঢুকিল।

যে বন্ধুটি মৃতদেহ আবিষ্কার করিয়াছিল সে বলিল,—পাইটে হবে না তা বলে দিচ্ছি; বোতল চাই দুটো। কি বল হরিদাস? ঠ্যালা ত' কম নয়!—

হরিদাসও ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বোতল দুটোই চাই, এবং ঠ্যালা ও কম নয়।......

শিবপ্রিয় বাক্স হাতড়াইয়া কি পাইল তাহা সেই জানে; কিন্তু তক্তপোষের নীচে হইতে যে বস্তুগুলি লইয়া সে বাহির হইয়া গেল তাহা কাঁসা আর পিতল।—

আজ শ্রাদ্ধের দিন।—

শিবপ্রিয়র কোনোই যোগাড় নাই; সে এক মতলব ঠাওরাইয়াছে।—

দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত শুইয়া কাটাইয়া সে উঠিল......

মায়ের কুশাসন হইতে একটি কুশ বাহির করিয়া লইয়া একবস্ত্রে যখন সে ঘাটে আসিল তখন নদীতীরে স্নানার্থী কেহ নাই।—

ঘাটের উপর সমতলস্থানে শিবমন্দির।—

জলের ধারেই খানিকটা গঙ্গাজল দিয়া সযত্নে সমতল পরিষ্কার করিয়া লইয়া শিবপ্রিয় সেই কুশ তিনখণ্ডে বিভক্ত করিয়া পাতিল......বালির একটি পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া লইয়া অঞ্জলির মধ্যে ধারণ করিয়া মনে মনে উচ্চারণ করিল,—দশরথ রামের হাত থেকে বালির পিণ্ড নিয়েছিলেন; মা, তুমিও আমার এই বালির পিণ্ড নাও।......

বলিয়া বালির পিণ্ডটা ত্রিখণ্ডিত কুশের উপর স্থাপন করিয়া সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল।......

কতক্ষণ সে ধ্যানস্থ হইয়া ছিল কে জানে, কি ধ্যান করিল সেই জানে; কিন্তু চোখ খুলিয়াই হঠাৎ সে ছ্যাঁৎ করিয়া চম্‌কিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল।...বালির পিণ্ড অন্তর্হিত হইয়াছে.....চারিটি অঙ্গুলির দাগ সম্মুখের সেই কুশক্ষেত্রে একেবারে স্পষ্ট।... ...নির্ণিমেষ চক্ষে সেই রেখা-কটির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে শ্রাদ্ধের এই অচিন্ত্যনীয় সার্থকতায় শিবপ্রিয়র সর্ব্বান্তঃকরণ কাঁপিয়া কাঁপিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দে বিস্ময়ে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া গেল।—

......প্রেতলোকবাসিনী জননী স্বহস্তে পিণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন!—

এ আনন্দ যে কতবড় আনন্দ, কাহারও অদৃষ্টে যদি এমনধারা ঘটিয়া থাকে তবে সেই তা' জানে। আনন্দে পরিতৃপ্তিতে কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া শিবপ্রিয় ঘাড় গুঁজিয়া চলিতেছিল; শিবমন্দিরের কাছে আসিতেই কে যেন ডাকিল,—এই বাঙ্গালী?

শিবপ্রিয় দাঁড়াইয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, কৌপীন-পরা দুইটা খোট্টা ছোঁড়া মন্দিরের ছায়ায় দাঁড়াইয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে।......

তাদের একজন বলিল,—এই দেখ্। বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া যাহা দেখাইল তাহাতে শিবপ্রিয়র মুহূর্ত্তপূর্ব্বের সীমাহীন থৈ থৈ অগাধ আনন্দ বজ্রাগ্নিশিখায় পুড়িয়া নিঃশেষে শুকাইয়া তার বুকের ভিতরটা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সেখানে যে কি বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল তাহা একমাত্র তিনিই জানিলেন যাঁহার অগোচর কিছুই নাই।......

শিবপ্রিয় দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—চুন্ চুন্ সএ হমারে মরী ঐ।

......বলিয়া অকস্মাৎ যখন সে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল তখন তাহারা বালির পিণ্ড মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছে।......

কিছুক্ষণ দৌড়াইয়াই শিবপ্রিয় ভুলিয়া গেল কেন সে

দৌড়াইতেছে। দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে চারিদিকে একবার চাহিল; একটি লোক ছাতি মাথায় দিয়া যাইতেছিল; শিবপ্রিয় তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—নদীটা কোন্‌দিকে বলে' দিতে পারেন ? নাইব।

—ওদিকে, ওই গলি দিয়ে গেলেই সাম্‌নেই।

শিবপ্রিয় বলিল,—ধোঁকা দিচ্ছ, বাবা ? ওদিকে আর নেই সরে গেছে।

—জানা আছে দেখ্‌ছি, তবে জিজ্ঞেস করে কি তামাসা করা হচ্ছিল ?—বলিয়া ছাতি মাথায় লোকটি শিবপ্রিয়র উন্মাদ দৃষ্টির দিকে চাহিয়া একটু ত্বরিত পদেই অগ্রসর হইয়া গেল।……

সেই দিন হইতে পথে পথে অহোরাত্র চীৎকার করে—
চুন্ চুন্ সএ হমারে মবী ঐ।
শব্দটা আর্ত্তনাদের মত শোনায়।
লোকে বলে—সেই পাগলাটা।
এইবার লোকে ঠিক বলে।

মনের আগুন

হাফেজ

এত অন্বেষণ কি তবে আমার বৃথাই হলো বন্ধু ?

কিন্তু বৃথাই হোক্ আর যাই হোক্—তাকে আমি চাই।

হয় পাব, নয় যাব।

প্রাণ হয় ত' সে প্রাণ-সখাকে পাবে, নয় ত' সে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক্।

আমার মনের আগুন—সে ত' নিব্‌বে না কোনোদিন; মরণের পর আমার কবর খুঁড়ে দেখো বন্ধু, দেখবে কাফনের ভেতর আগুন তখনও ধোঁয়াচ্ছে।

মুখ দেখাও সখা,—মুখখানি তোমার দেখাও একটিবার।—দুনিয়া অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠুক্।

খোলো খোলো বন্ধু, মুখের আবরণ খোলো।—নরনারীর কোলাহল সুরু হোক্।

মৃত্যুর আর দেরি নেই,—প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হলো। কিন্তু বন্ধু, খেদ রয়ে গেল মনে—

তোমার মুখখানি দেখার খেদ।

চির-দুঃখীর মনের খেদ বুঝি রয়েই যায়।

বললাম,—মনকে আমার কত বুঝিয়ে বললাম যে, তার থেকে মন তোমার ফিরিয়ে নাও, সে বড় নিষ্ঠুর। মন কি বললে জানো ? বললে, একাজ তোমার নয়; মনের ওপর যার অধিকার আছে সেই পারে ফিরিয়ে নিতে।

জানি জানি তোমার প্রত্যেকটি এলোচুলের বাঁকে পঞ্চাশটি করে' ফাঁদ আছে বন্ধু জানি। আমার এ ভাঙা-মন তোমার সে বাঁকের সঙ্গে পেরে উঠবে কেমন করে' বল ?

বাতাস কেন বয় জানো—এই নিকুঞ্জের পাশে পাশে ? ঠিক্ তোমার ওই মুখের মত কোনও মুখের সন্ধানে। ফুটেছে কিনা তাই দেখে।

চঞ্চল লোকের মত বারে বারে নতুন প্রেমিকার খোঁজে আর কত ঘুরব বন্ধু ?

প্রাণ যতদিন আছে এই দেহে, ততদিন আমি আছি,—আর আছে তোমার নিকেতনের দুয়ার !

স্বামী-স্ত্রী

শ্রী মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

১

এক একটি ব্যক্তির এক একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে। অনেক ব্যক্তির সংহতির মধ্যেই সমাজের অস্তিত্ব; ব্যক্তিকে বাদ দিয়া সমাজের একটি স্বতন্ত্র সত্তা কেহই কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই। এই জন্যই সমাজকে চালনা এবং শাসন করার মানে ব্যক্তিকে চালনা এবং শাসন করা ছাড়া আর কিছুই নহে। তবু কিন্তু বহু ব্যক্তির এই যে সমষ্টিগত শাসন ইহা কখনো ঠিক ব্যক্তিগত শাসন হইতে পারে না; সমষ্টিগত শাসন কার্য্যতঃ চিরকালই আংশিক ভাবে ব্যক্তিকে শাসন হইয়া দাঁড়ায়। কারণ যেখানে একটি মানদণ্ডে বহুর কর্ম্মের হিসাব লইতে হয়, সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম্মকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া দেখিবার অবসর নাই; অথচ এক ব্যক্তির কর্ম্ম হইতে আর এক ব্যক্তির কর্ম্মের যাহা প্রকৃতিগত পার্থক্য তাহা ওই সূক্ষ্ম ভেদের উপরই অনেক স্থলে নির্ভর করে। অনন্ত ব্যক্তির এই যে অসীম বৈচিত্র্য তাহার অন্তরে একটি অখণ্ড অনির্ব্বচনীয় ঐক্যের যোগসূত্র রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তা বলিয়া সমষ্টির ধারণা কখনো মাত্র ওই ঐক্যটুকুর ধারণায়ই পরিপূর্ণ হইতে পারে না। ওই অনন্ত বিচিত্রতাকে যতক্ষণ সমগ্রের মধ্যে স্বীকার না করিব ততক্ষণ কখনই সত্যকে পাইব না। সমাজ-শাসন কিন্তু ব্যক্তি হইতে ব্যক্তির এই যে ভিন্নতার দিকটি, তাহাকে কার্য্যতঃ স্বীকার করিতে চাহে না। বরং যথা সম্ভব এই বিচিত্রতাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া কতকগুলি মোটামুটি সাধারণ ধর্ম্মের সমতলে সমাজকে দাঁড় করাইয়া তবে সমাজ শান্ত হয়।

এই কারণেই সমষ্টির শাসনে—সামাজিক, ধার্ম্মিক এবং রাষ্ট্রিক জগতে—সর্ব্বত্রই মানুষের বৈচিত্র্যময় সত্তাকে ধারণা করিবার ব্যবস্থা নাই; সর্ব্বত্রই মানুষকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ধরিবার প্রয়াস রহিয়াছে মাত্র। হয়ত সাময়িক সুবিধা তাহাতে অল্প বিস্তর হইয়াছে, কিন্তু সত্য অস্বীকৃত হওয়ার ফলে, এই সমস্ত ব্যবস্থাই আপনাদের অপূর্ণতার ধিক্কার বহন করিয়া আসিতেছে।

২

সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম-ব্যবস্থার সর্ব্বত্রই এই অসত্যের রূপ দেখিতে পাই।

ধর্ম্ম-ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করি। জড় পদার্থের

মধ্যে ভগবত্তার আরোপ, কোনো কোনো বিশেষ দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মধ্যে আধ্যাত্মিক নিগূঢ় ব্যাপারের সম্ভাবনা এবং পুণ্যার্জ্জনের প্রলোভন, স্থান বিশেষের ধূলি এবং জলের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির সঞ্চরণ, মনুষ্য বিশেষকে গুরু-ভগবান্, জগদ্‌গুরু বলিয়া বিশ্বাস, খলিফা —পোপ—পুরোহিতের হাঁ-নার জোরে স্বর্গ-রাজ্যের তোরণ মুক্ত অথবা রুদ্ধ হওয়া ইত্যাদি হাজারো রকমের ব্যাপারে পরিপূর্ণ সত্যকে কোনো না কোনো ভাবে অস্বীকার করা হইতেছে দেখি। এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে আংশিক এবং আপেক্ষিক সত্য এবং সার্থকতা কিছু হয়ত সময়-বিশেষে, পাত্রবিশেষে ছিল ও আছে, কিন্তু ইহারা যে আংশিক হিসাবেই সার্থক এ কথা ধর্ম্ম-শাসন স্বীকার করিতে পারে না। সেই জন্যই এই সব ধর্ম্ম-শাসন একদিক দিয়া অধর্ম্ম হইয়া, মিথ্যা হইয়া ঘোরতর অকল্যাণের সৃষ্টি করিতে থাকে।

রাষ্ট্র-শাসনেও তাই। রাজা বিষ্ণু, আইন দেববাণী, আদালত ধর্ম্মরাজের আসন; রাজাজ্ঞার অবহেলা পাপ, আইন-বিরোধিতা নারকীর ধর্ম্ম, এই সব বিশ্বাস ও বুলি বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। রাষ্ট্র-শাসনের মূলে মানুষের অন্তর্নিহিত একটা নৈতিক প্রেরণা আছে, কিন্তু সেই প্রেরণা একেবারে ভুল ভ্রান্তির অতীত দৈব-প্রেরণা একথা তো স্বীকার করা চলে না। অথচ রাষ্ট্র-শাসন কোনো না কোনো কারণে সেই কথাটিই শেষে জপিতে ও জপাইতে সুরু করিল; একটা মিথ্যার সুলভ উপায়ে সে আপনার শক্তি এবং প্রতাপকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিল। স্বার্থ ও অহমিকা আসিয়া সত্যকে বিকৃত করিল। কল্যাণ কোথায় দাঁড়াইবে? তাই সর্ব্বদেশে রাজ-শাসনকে নানাভাবে তাহার খণ্ডজ্ঞানের দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইতেছে; যাহাকে সে ভাগবতী শক্তি বলিয়া প্রচার করিতেছিল তাঁহা যে নিতান্তই মানবীয় ভুল ভ্রান্তির অধীন, একথাও অপমান ও অসম্মানের মধ্যে মাথা পাতিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে।

সমাজও এই মিথ্যার পথে পিছাইয়া যায় নাই। মানুষই সমাজ গড়িল, সমাজের নিয়ম তাহারই ব্যষ্টিগত সত্তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার পথে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। সে নিয়ম পথচলার নিয়ম। যুগে যুগে পথের বৈচিত্র্য নিয়মকে বিচিত্র করিল, কত নিয়ম ভাঙিল, কত গড়িল। কিন্তু এখানেও তাহার সেই সাময়িক সুবিধার মোহে মিথ্যা বলিবার মোহ। অচলায়তনের প্রতিষ্ঠা হইল—যে ছিল চলার পথে যাত্রী, সে হঠাৎ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অচলাসনে বসিয়া গেল। জাতি-ব্যবস্থার অচল কাঠাম হইল, মানুষ মানুষ রহিল না, কর্ম্ম-যন্ত্রের এক একটি বিশিষ্ট অঙ্গের মত সে এক একটা বিশিষ্ট ধর্ম্মের প্রতীক হইয়া রহিল—মনুষ্যত্বের বিচিত্র সত্য অস্বীকৃত হইল, পিতা পরম গুরু, মাতা সাক্ষাৎ ভগবতী, স্বামী পরম গুরু ইত্যাদি নানা মিথ্যা মানুষকে আচ্ছন্ন করিল। কিন্তু মিথ্যার দোহাই কত কাল চলিতে পারে? তাই কলিযুগ আসে, ব্যষ্টি বৈচিত্র্যের দাবী একদিন জাগে।

৩

এই অজস্র মিথ্যা-আরোপের আলোচনা বিশাল ব্যাপার; আজ শুধু একটি মাত্র সামাজিক সম্বন্ধের দিকে দৃষ্টি চালনা করিয়া দেখিতে চাই যে উহার মধ্যে কতখানি সত্য মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। সমাজ-জীবনের মূল হইতেছে নরনারীর মিলনের মধ্যে। এই মিলন-সম্বন্ধটিকে সমাজ স্বামী-স্ত্রীর আদর্শে বাঁধিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর আদর্শ লইয়াই আজ আমাদের আলোচনা।

নর-নারীর মধ্যে মানবসমাজে বহুতর সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে; পিতা-কন্যা, মাতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগ্নী, সখা-সখী, আরো কত বিচিত্র রকমের বন্ধন; প্রত্যেকটির মধ্যে একটি বিশেষ রসের স্ফূর্ত্তি। নর-নারীর মধ্যে এই সমস্ত নানা রকমের বিচিত্র সম্বন্ধের রসবৈচিত্র্য লইয়াও আমাদের আলোচনা নহে। সমাজ-জীবনের গোড়াপত্তন মানব-মানবীর যে সম্বন্ধে সেই সম্বন্ধটির স্বরূপ নির্ণয়ই আমাদের উদ্দেশ্য।

সমাজ যাহাকে স্বামী-স্ত্রী বলিয়া নাম দিয়াছে সেই সম্বন্ধটি একটি সহজ সম্বন্ধ নহে; সমাজ ইহার মধ্যে স্ত্রী-

পুরুষের দুইটি স্বাভাবিক সম্বন্ধের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছে। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে এই দুইটি বিশিষ্ট সম্বন্ধের নাম কাম ও প্রেম। অনেকেই ভালবাসা নাম দিয়া এই দুইটিকেই একই বস্তু বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন দেখিতে পাই। আমরা এই দুইটিকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিব এবং ইহাদের স্বাতন্ত্র্য কোথায় দু'এক কথায় তাহারও ইঙ্গিত করিবার চেষ্টা করিব।

প্রাণের ক্রমবিকাশের ধারাটি অনুসরণ করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে অতি নিম্নস্তরের প্রাণীর মধ্যেও প্রাণ আপনাকে পুরুষ প্রকৃতির দ্বিধারায় বিভক্ত করিয়া আপনার প্রকাশটিকে জটিলতর ও বিচিত্রতর করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বপ্রাণ আপনারই সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে পুরুষ প্রকৃতির এই যৌন ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যে প্রাণ-ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে, তাহাই যেন আবার মিলিয়া আপনাকে অখণ্ড পরিপূর্ণতায় নিমজ্জিত করিতে চায়।

এই যে প্রাণের ক্ষেত্রে যৌন-প্রেরণার কথা বলিলাম ইহার মূলে বিশ্বপ্রাণের হয়ত এই আত্মসংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু প্রত্যক্ষত ব্যক্তির অন্তরে এই যৌন-প্রেরণার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য সুখ-সম্ভোগ, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কোনো উদ্দেশ্যই যৌন-প্রেরণার মূলে সজাগভাবে দেখা দেয় না। নিজ নিজ তৃপ্তির কামনায় পুরুষ-প্রকৃতি পরস্পরকে প্রার্থনা করে ও মিলিত হয়। ইহারই নাম কাম। জীবজগতে স্ত্রী পুরুষের মিলনের মূলে এই কামতত্ত্ব অত্যন্ত বড় হইয়া আছে।

এই কামতত্ত্বের দিক দিয়া স্ত্রী-পুরুষের মিলন ব্যাপারের আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে এখানে একটিমাত্র বিশেষ নরের সহিত আর একটি বিশেষ নারীর যৌন মিলনের কোনো অর্থ নাই। সুতরাং যদি নর-নারীর মিলনটি একমাত্র কামজ সম্বন্ধই হইত তাহা হইলে সেখানে দুটি প্রাণীর জীবনব্যাপী সম্বন্ধ কখনো সত্য হইতে পারিত না। অথচ জীবনের ক্ষেত্রে দুটি মাত্র নর-নারীর একান্ত মিলনের ও জীবনব্যাপী নিষ্ঠার প্রেরণাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কিম্বা মানুষ কোনো মিথ্যা আদর্শের মোহে এই নিষ্ঠার সংস্কারটিকে মানুষের চিত্তে দৃঢ়মূল করিয়াছে বলিয়াও এই সত্যটিকে উপেক্ষা করা চলে না। স্বীকার করিতে হয় যে জীবনের সর্ব্বত্র না হইলেও কোথাও কোথাও এই প্রেরণাও একান্ত সত্য হইয়া দেখা দিয়াছে।

কামতত্ত্বের মধ্যে ব্যক্তির কোনো স্থান নাই; সেখানে সুখসম্ভোগের সাধন হিসাবেই ব্যক্তির যা কিছু মূল্য; ব্যক্তির যে একটি স্বতন্ত্রতাব বিশেষ রস এবং মূল্য তাহা সেখানে অগ্রাহ্য। আঙুর যখন রসনার তৃপ্তি সাধনের জন্যই বাঞ্ছিত তখন রসের মূল্যেই আঙুরের মূল্য, সেখানে কোনো একটি আঙুরের ব্যক্তিগত বিশেষ রূপের মূল্যটি একান্ত উপেক্ষিত হইয়া যায়। আঙুরকে তখন একটি কোনো রসের দাতা হিসাবে দেখিতেই পারা যায় না, আঙুরকে তখন ভোগ্য বস্তু হিসাবেই যা কিছু আদর করিতে হয়। ফলকথা, কামের ক্ষেত্রে ভোক্তা আর ভোগ্য মাত্রই বর্ত্তমান, একজন সেখানে ভোগের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে আর তাহার ভোগ্য বস্তু তাহার ভোগের প্রতীক্ষায় পড়িয়া আছে। দাতা ও গ্রহীতার রসমধুর সম্বন্ধ সেখানে নাই। নর সেখানে পরাক্রান্ত ভোক্তা, নারী সেখানে বীরভোগ্যা, জেতার পুরস্কার। পশু-পক্ষীই হোক আর মানুষই হোক যতক্ষণ সে এই কামতত্ত্বের অধীন, ততক্ষণ নর-নারীর মধ্যে এই সম্বন্ধই একমাত্র সত্য হইতে বাধ্য।

জীবন কিন্তু শুধু কামলোকেই আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। দেখিতে পাই, জীব-জগতে কেবল মানুষে নহে অন্যত্রও পুরুষ প্রকৃতি পরস্পরকে শুধু আপনাদের ভোগ চরিতার্থতার দিক দিয়াই কামনা করে না। মানুষের মধ্যে বিশেষ করিয়া দেখিতে পাই যে আপনার ভোগ-চরিতার্থতাকে অতিক্রম করিয়া নর-নারী পরস্পরের মধ্যে আরো একটি নিবিড়তর রসের এবং আনন্দের সন্ধান পাইয়াছে যাহার ফলে নর-নারী পরস্পরের নিকট ভোগের

সহায় না হইয়া একটি অপূর্ব্ব আনন্দময় 'যুগল' স্বরূপে দেখা দিয়াছে। এই যে পরস্পরকে আনন্দময় রূপের মধ্যে দেখা ইহাকেই ভালবাসা বলি, প্রেম বলি। জীবন কাম-লোককে অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে এই প্রেমলোকের দিকে প্রয়াণ করিতেছে দেখিতে পাই।

কিন্তু তা বলিয়া একথা বলা চলে না যে এই প্রেম-প্রেরণা কাম-বৃত্তির মতই জীবনের ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র পরিস্ফুট এবং ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছে। তবে অনেকে যেমন বলিতে চান যে কামই জীবনের একমাত্র সত্য, প্রেম ভালবাসা মাত্র বাহিরের সাজ পোষাক,—সেই কথাটি যে সত্য নহে তাহাই বলিতে চাই। ছোট একটি গাছে কেবলি পাতা দেখিয়া যদি কেহ বলেন যে পাতা জন্মানোই গাছের একমাত্র বৃত্তি আর ফুল ফল হইতেছে একটা আনুসঙ্গিক ব্যাপার তাহা হইলে যেমন তাঁহার কথা ভ্রান্ত হইবে তেমনি জীবনের বিকাশের ধারায় প্রেম সর্ব্বশেষের প্রকাশ বলিয়া এবং জীবনের ক্ষেত্রে আজও তাহার প্রকাশ ক্ষীণ বলিয়া যদি কেহ প্রেমকে তুচ্ছ এবং মিথ্যা বলিয়া একমাত্র কামবৃত্তিরই সত্যতা প্রমাণ করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহার উক্তিকেও ভ্রান্ত বলিতে হইবে।

সে যা-হোক, বলিতেছিলাম যে সমাজ স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে, বিবাহের মধ্যে, এই দুটি বৃত্তির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছে।

৪

তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সমাজতন্ত্র মানুষের মধ্যে সুপ্রকট কামময় সত্তাটিকেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছে, মানুষের মধ্যে যে ভবিষ্যৎ প্রেমময় সত্তার সম্ভাবনা অপ্রকট হইয়া আছে তাহার কথা সমাজতন্ত্র তেমন করিয়া ভাবিয়া দেখিতে পারে নাই, সেই জন্য সমাজতন্ত্র যা-কিছু বিধিব্যবস্থা গড়িয়াছে তাহা ওই সাধারণ কামলোকের মানুষটিকে লইয়া; শুধু প্রয়োজনের দায়েই সমাজতন্ত্র মানুষের মধ্যে এই প্রেমবৃত্তিকে গৌণ এবং পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছে।

কামপ্রেরণা হইতে যত কিছু কর্ম্মের উদ্ভব হয় সেই সমস্তেরই একমাত্র লক্ষ্য আপনার সুখ সুবিধা এবং স্বার্থ। এই সুখ সুবিধা এবং স্বার্থ রক্ষার জন্য সমাজ-সংহতি যতই বাঞ্ছনীয় হোক না কেন সমাজ কখনো প্রত্যেক ব্যক্তির একান্ত আত্মতৃপ্তির দ্বারা টিকিয়া থাকিতে পারে না। যদি কেবল স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে মানুষ সমাজে সংহত হইত তাহা হইলে অচিরেই স্বার্থে স্বার্থে আহত হইয়া সমাজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। সমাজতান্ত্রিককে তাই নানা ছলে, জানিয়া হোক, না জানিয়া হোক, পরার্থপর প্রীতির বাণী ঘোষণা করিতে হইয়াছে। এইখানেই সমাজ-তান্ত্রিককে একটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

সমাজস্থিতির উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে প্রীতির প্রেরণা, আত্মস্বার্থ-নিরপেক্ষ সর্ব্বমানবের কল্যাণ-কামনার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু মানুষের মধ্যে এই প্রীতির তেমন বিকাশ কোথায়? সমাজতান্ত্রিক দেখিলেন যে, বিবাহের ক্ষেত্রে নর-নারীর মিলনের প্রধান প্রেরণা—এমন কি, একমাত্র প্রেরণা—জোগাইয়া চলিয়াছে কাম, অথচ এই মিলনকে যদি কামের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে সমাজ রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ কামবৃত্তি কখনো নরনারীকে স্থায়ী বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। কামলোকে মানুষ তাহার শক্তির দ্বারা যথেচ্ছভাবে স্বার্থ সাধন করিতে চায়, কাম-বৃত্তি তাহাকে কেবলি স্বাধিকার বিস্তারের রক্তাক্ত পথে টানিয়া লইয়া যায়। সমাজ-তান্ত্রিক দেখিলেন যে মানুষের মধ্যে আজও সহজ প্রীতি এবং কল্যাণ-বোধ সহজ হইয়া এমন শক্তি অর্জ্জন করিতে পারে নাই যাহাতে সে কামনার সঙ্ঘাত নিবারণ করিতে পারে। এই জন্যই আপাততঃ সমাজ রক্ষার উদ্দেশ্যে বিবাহ ব্যাপারটিকে উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য সমাজ-তান্ত্রিককে মিথ্যার ভেল্কী সৃষ্টি করিতে হইল।

যেখানে নর-নারীর মিলন হইল কামের প্রেরণায় সেখানে প্রেম থাকিবেই এত বড় জবরদস্তি প্রাণের উপর করা চলে না। আবার যেখানে কামের আকর্ষণ জাগে নাই সেখানে নর-নারী পরস্পরকে ভাল বাসিবে না এই নিয়মও চলিতে পারে না। অথচ সমাজতন্ত্র ইহাই

চায়। তাই নানা রকমের ধার্ম্মিক এবং সামাজিক শাসন অনুশাসন আসিয়া মানুষের পথটিকে সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিল। ভালবাসার স্বাধীনতা রহিল না। বিবাহের মধ্যেই ভালবাসার আবির্ভাব হোক, ইহাই সমাজতান্ত্রিকের কামনা হইয়া দাঁড়াইল।

সতীত্বের আদর্শের জন্ম হইল এইখানে ; কিন্তু মজা এই যে এইখানে সৎ-ত্বের আদর্শ জাগিল না। ইহা হইতে প্রমাণ হয় না কি যে ভালবাসার আদর্শকে সমাজ নর-নারী উভয়ের দিক দিয়াই আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করে নাই ? সমাজ শুধু সুবিধার খাতিরেই—আর তাহাও একতরফা—সতীত্বের আদর্শ দিয়া নারীর চোখে পটি বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে।

কারণ সমাজের মধ্যে যদি ভালবাসার আদর্শ স্বীকৃত হইত, তাহা হইলে নর-নারী উভয়েরই ব্যক্তিত্বের মূল্য ও মর্য্যাদা পরস্পরের নিকট সত্য হইত এবং তখন এক দিক দিয়া যেমন নারী স্বেচ্ছায় সতীত্বকে বরণ করিত, অপর দিক দিয়া নরও সৎ-ত্বকে, ভালবাসার নিষ্ঠাকে সত্যকার মর্য্যাদা দিত। তাহা হয় নাই। অন্ততঃ পক্ষে যদি নর-নারী দুই পক্ষই সমান শক্তির অধিকারী হইত তাহা হইলেও নর যেমন আপনার সুবিধার জন্য নারীকে সতীত্বের আদর্শে বাঁধিতে চাহিয়াছে, নারীও তেমনি পুরুষকে সৎ-ত্বের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিত। তাহা হইতে পারে নাই। পরাক্রান্ত পুরুষ তাহার স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে নারীকে সতীত্বের বেদীমূলে বলি দিয়াছে ; তাহাকে জন্ম-জন্মান্তরের স্বত্ব-সম্বন্ধের মোহ দেখাইয়াছে, স্বামীই ইহপরলোকের ত্রাণ-কর্ত্তা বলিয়া তাহার বিচারকে ভ্রান্ত ও মুগ্ধ করিয়াছে, স্বামীর প্রতি ভালবাসা ও নিষ্ঠাহীনতাকে অনন্ত নরক-যন্ত্রণার ভয়ে জর্জ্জরিত করিয়াছে।

পুরুষ কিন্তু ভুলিয়াও নারীর একান্ত নিষ্ঠাকে আপনার নিষ্ঠা দিয়া শ্রদ্ধা করে নাই, বরং নারীকে সে বরাবর ভোগ সম্পদ্ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছে। পুরুষ নারীর ভোক্তা আর নারী পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়াই গণ্য হইয়া রহিল। এই জন্তই নির্লজ্জ পুরুষ তাহার সন্তানকে 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি' এই শ্লোক শিখাইতে এতটুকু দ্বিধা অনুভব করিল না। এই কারণেই বাসর-ঘরেও স্বামীর দেহান্ত হইলে বেহুলাকে স্বর্গ পর্য্যন্ত গিয়া স্বামীর গলিত দেহকে জিয়াইবার আশায় কত না দুরূহ কর্ম্ম করিতে হয়, আর তদভাবে বালবিধবাকে আমরণ সেই মুখ-পর্য্যন্ত-না-দেখা স্বামীর দু'খানি অব্যবহৃত খড়মের পূজা করিয়া পরম সতীত্বের পরীক্ষা পাশ করিতে হয় ; আর ষাট বৎসরের সর্ব্বসুখদুঃখের সঙ্গিনীকে বিসর্জ্জন দিয়া পুরুষকে অনতিবিলম্বে নাতিনীসমা কন্যাকে অঙ্কশায়িনী করিয়া 'সস্ত্রীকং ধর্ম্মমাচরেৎ' এই শ্লোকের সমর্থ করিয়া মরিতে হয়। তাই আজও ধর্ম্মসভায় সেই সতীর প্রশংসা আর মুখে ধরে না যে তাহাঁর অথর্ব্ব স্বামীকে বেশ্যাবাড়ী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল আর সেই পুরুষের প্রশংসাও শেষ করিয়া উঠা যায় না যে অতিথি-সেবার মাহাত্ম্যকে চিরউজ্জ্বল করিবার উদ্দেশ্যে আপনার স্ত্রীকে অতিথির ভোগার্থে প্রেরণ করিয়াছিল। এই সুন্দর মনোভাবের ফলেই নারী স্বামীর প্রতি অনুরক্ত হইলে তাহাকে সতী বলিয়া প্রশংসা করি, আর স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হয় তাহা হইলে তাহাকে স্ত্রৈণ বলিয়া নিন্দা করি। সমাজতান্ত্রিক ইহাতে পরম পরিতুষ্ট থাকেন।

কিন্তু পার্ব্বতী দেবদাসকে ভালবাসুক, রমা রমেশকে ভালবাসুক, শৈবলিনী প্রতাপকে ভালবাসুক, সমাজের স্বার্থ এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কাতর পুরুষ একেবারে হাহাকার করিতে থাকিবেন।

এই মিথ্যা সামাজিক ভেদনীতি কতকাল চলিতে থাকিবে ? একমাত্র উত্তর মুখে আসে, যতকাল পুরুষ তাহার স্বার্থপরতাকে জয় না করিতে পারিবে কিম্বা যতকাল নারী তাহার অধিকারটিকে না আদায় করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু নারী কি কোনো দিন পুরুষের মত জবরদস্তির দ্বারা আপনার অধিকার অর্জ্জন করিতে পারিবে ?

৬

সমাজতান্ত্রিক স্বামীস্ত্রীর মধ্যে এই যে মিথ্যা সম্বন্ধের

প্রচার করিয়াছেন, ইহার মূলে তাঁহার সমূহগত কল্যাণের প্রয়াস রহিয়াছে একথা অস্বীকার করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাটিও স্বীকার করিতে হইতেছে যে, সমাজতান্ত্রিক যে সমষ্টির কল্যাণ চাহিয়াছেন তাহার মধ্যে নারীর সত্যকার স্থান দিতে তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন। এক কথায়, তিনি পুরুষ-গণতন্ত্রের কথাটিই ভাবিয়াছেন ও সেই পুরুষ-গণতন্ত্রের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাহার বিধি-ব্যবস্থা রচনা করিয়াছেন। সেইজন্যই পুরুষের বহুবিবাহ কখনো নিন্দনীয় হইল না, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরও নারীর পক্ষে অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইল।

৭

চলিত বিবাহ ব্যাপারে এবং ভূতকাল হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া স্বামী-স্ত্রী সংক্রান্ত মনোভাবের মধ্যে আমাদের সঙ্কীর্ণতাটুকু বাসা বাঁধিয়া পরম সুখে দিন কাটাইতেছে। বর্ত্তমান কালে যে উক্ত আদর্শকে সনাতনত্বের গৌরবে গরীয়ান্ করিয়া নৃত্য করিলেও উহা আমাদের মনের জড়তা এবং সঙ্কীর্ণতাকে গোপন করিতে পারিবে না তাহা আমরা ভুলিয়াই থাকিতে চাই।

মানব-সমাজের ক্রমাভিব্যক্তির পথে তাহাকে যুগে যুগে নানা রকমের আদর্শ লইয়া চলিতে হইয়াছে, কিন্তু কোনো আদর্শই তাহার নিত্যকালের সাথী হইতে পারে নাই, বিবাহের আদর্শও না। মানব-ইতিহাসে একদিন ছিল,—কোনো কোনো জাতির ইতিহাসে আজও সেদিন হয়ত আছে,—যখন অসভ্য মানুষ তাহার দেহের শক্তিকেই সকল সমস্যার মীমাংসায় শেষ বিচারক বলিয়া মনে করিত; জন্তুজগতে সেই আদর্শ বহুকাল হইতেই চলিয়াছে। সেই দিন পুরুষই ছিল সমাজের স্রষ্টা এবং চালক, আর নারী তাহার পরাক্রমের রথচক্রে বাঁধা পড়িয়া নিষ্পিষ্ট হইয়া চলিয়াছিল। সেই দিন নারী ছিল লুণ্ঠনের সামগ্রী, পরাক্রান্তের বহন করিয়া লইয়া যাইবার বস্তু।—'বিবাহ' শব্দটি কি সেই দিন সৃষ্ট হইয়াছিল? দুর্ব্বল নারী সেই দিন হইতে বিবাহের এই হেয় আদর্শকে স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। তাহার ভালবাসা, তাহার সতীত্ব,—ভয়েরই রূপান্তর মাত্র। ভয়ের তাড়না—ইহলোকের নিদারুণ লাঞ্ছনা এবং পরলোকের ততোধিক নরক-ভীতি—তাহাকে পতিপ্রাণা করিয়া তুলিল, ভয়ে ভয়ে সে চিতায় পুড়িয়া সতী হইল। তাহা লইয়া পুরুষের নিলজ্জ গর্ব্বের কি আর সীমা আছে!

মানব-সমাজ কিন্তু আজও সেই বর্ব্বরতার যুগে বাস করিতেছে না। এখনো তাহার দুটি পা-ই কামলোকের উপর ভর করিয়া আছে মানি, এখনো তাহার শারীরিক শক্তির এবং পাশবিক যন্ত্রশক্তির মোহ কাটে নাই জানি, তবু বলিব যুগ পরিবর্ত্তনের হাওয়া বহিয়াছে। মানব-সমাজের দৃষ্টি আজ প্রেমলোকের পানে ছুটিয়াছে; পাশবিক শক্তির প্রয়োগ করিতে গিয়া তাহার লজ্জা হয়, বাক্যে অন্ততঃ সে আর আপনার স্বার্থপরতার আদর্শকেই সর্ব্বোচ্চে তুলিয়া ধরিতে সাহস পায় না। প্রেমলোকে মানুষের যে আদর্শ, যে মূল্য এবং মর্য্যাদা, তাহাকে স্বীকার করিবার যুগ আসিয়াছে।

৮

কামলোকে মানুষের জীবন তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ পাইতে পারে নাই। ব্যক্তি সেখানে কামতৃপ্তির উপকরণ হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে, সুতরাং ব্যক্তির পরিপূর্ণ মর্য্যাদা সে কখনো পায় নাই। নারীর যে রসমধুর ব্যক্তিত্ব, পুরুষ তাহাকে যুগ যুগ উপেক্ষা করিয়া শুধু তাহাকেই তো খর্ব্বিত এবং দলিত করে নাই, নারীর পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সহিত তাহার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ মিলনকে আহত করিয়া সে নিজেও বঞ্চিত হইয়াছে, জীবনের আনন্দময় বিকাশকেও বাধাগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রেমের আদর্শ—স্বতন্ত্রতার আদর্শ, সাম্যের আদর্শ, ব্যক্তিবাদের আদর্শ। প্রেমের আদর্শকে স্বীকার করিতে গেলে সমাজতন্ত্রেরই যে শুধু আমূল পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী তাহা নয়, জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে এই আদর্শ বিপ্লব আনয়ন করিবে। সে কথা এখানে থাকুক। বিবাহের ক্ষেত্রে

এই আদর্শ সর্ব্বপ্রথম নারীকে পুরুষের সমান অধিকারে অধিকারিণী করিবে. তাহাকে চিরদাসীত্বের হেয়তা হইতে মুক্তি দিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্যকে যথাযথ সম্মান দিয়া পুরুষ তাহার প্রেম প্রার্থনা করিবে। আজ ভয়ের দ্বারা যে-সতীত্বের নকল আদর্শ সৃষ্টি চলিতেছে, সেদিন প্রেম তাহার সত্য স্বরূপ বিকশিত করিয়া তুলিবে—শুধু সতীত্বের নহে, সৎ-ত্বেরও।

এক কথায় এবং এক দিনে এই প্রেমের আদর্শ মানব জীবনকে সমূহগত ভাবে আবিষ্ট করিতে পারিবে না জানি। আদর্শ চিরকালই ধরা ছোঁয়ার অনেকটা উর্দ্ধে বিরাজ করে। কিন্তু তা বলিয়া আজিকার জীবনে যাহা সত্য নহে, তাহা সহজসাধ্য বলিয়াই যে বরনীয় তাহাও নহে। প্রেমের আদর্শ সমাজে নূতন সমস্যা নূতন জটিলতা লইয়া আসিবে। কিন্তু তাহাই যদি সত্য হয়, মানব জীবনের সার্থকতা যদি প্রেমের মধ্যেই সম্ভব হয়, তাহা হইলে সমাজতান্ত্রিককে সেই আদর্শেই সমাজের বিধি ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে। শুধু সুবিধা-বাদের অজুহাতে প্রেমকে পশ্চাতে রাখিয়া, ভালবাসার কথাটিকে হিসাবের মধ্যে না আনিয়া কাজ সারিবার ব্যবস্থা করিলে চলিবে না।

কথাটিকে আরো স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন। বিবাহের মধ্যে মানুষ একটি সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করে, সেটি পিতৃ-মাতৃত্বের গুরুতর দায়িত্ব। মুখ্যতঃ বিবাহ মানুষের কামনা পরিতৃপ্তির উপায়, আরো একটু উর্দ্ধে, বিবাহ নর-নারীর ভালবাসার মিলনোৎসব; কিন্তু গৌণ ভাবে বিবাহ মানুষের নিকট সামাজিক দায়িত্ব লইয়া আসে। যৌন মিলনের ফল ভবিষ্যতের গুরুতর দায়িত্ব বলিয়াই বিবাহের মধ্যে পুরুষ নারীকে তাহারই একান্ত অনুগত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছে। সমাজ ইহার বেশি বিবাহের মধ্যে প্রার্থনা করে নাই। সমাজ বিবাহকে কোনো রস-নিবিড় পরম পরিচয়ের সাধনা বলিয়া স্বীকার করে নাই। স্পষ্টতই বিবাহকে কামাত্মক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া, পুত্রলাভই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মানিয়া লইয়া সমাজ তদনুযায়ী বিধি ব্যবস্থা গড়িয়াছে। এই কারণেই বহুবিবাহ নিন্দার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। সমাজ শুধু চাহিয়াছে বিবাহের দ্বারা মানুষের কাম-প্রেরণাকে যথাসম্ভব নিয়মিত করিয়া সামাজিক শৃঙ্খলাকে রক্ষা করিতে। ভালবাসার কথা সেখানে উঠিতেই পারে নাই; অথচ বিবাহ বন্ধনকে স্থায়ী করিতে হইলে অন্তরে কোনো না কোনো রকমের বাঁধন পড়া চাই। সেই জন্যই সমাজতান্ত্রিক নানা রকমের সামাজিক নিন্দা প্রশংসার এবং ধার্ম্মিক ভীতি এবং প্রলোভনের ব্যবস্থা করিয়া নারীকে সতী করিবার যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছে। ইহার ফল কি হইয়াছে তাহা বলিতে যাওয়া.....।

৯

বলিতে গেলেই নানা রকম তুলনা জাগিয়া উঠে। প্রথম অঙ্গুলি সঙ্কেত করা হয় সগর্ব্বে ওই পশ্চিমের পাড়ার গার্হস্থ্য জীবনের দিকে। বলা হয়, ওই তো তোমার প্রেমের বিবাহ, ভালবাসার ভিত্তিতে বিবাহ; ভালবাসা—বিবাহ—এবং অনিবার্য্য ডাইভোর্স—খুবই সুন্দর! বলিতে গর্ব্বে বুক ফুলিয়া উঠে, আপনাদের দিকে আঙুলটা ইঙ্গিত করিতে থাকে,—সতীত্ব কাহাকে বলে চাহিয়া দেখ; বিবাহের পরদিন হইতে ভালবাসা একেবারে সুনিশ্চিত আর সে ভালবাসা মরণের পরও একাদশীর পর একাদশী নির্জ্জলা উপবাসের তপস্যায় মহিমান্বিত! অথচ সেই সতীই যদি পতির কোলে মাথা রাখিয়া অক্ষয় স্বর্গে গমন করেন, তাহা হইলে, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই শূন্য গৃহ আবার নবীনা গৃহলক্ষ্মীর আবির্ভাবে সুন্দর এবং পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তাই, যে-বন্ধনের একটা দিক এত আল্‌গা আর অন্য দিকটা এত কসিয়া বাঁধা, সেই বন্ধনের নাম কি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা যায়—ইহাই কি হিন্দু-সমাজের স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র 'শাশ্বত প্রেম', যাহা জন্মজন্মান্তরের গোলক-ধাঁধা ভেদ করিয়া চলিয়াছে? মিথ্যাকে পালিস্ করিলে সত্যকেও সে হার মানাইতে পারে, কিন্তু সত্যকে সে মারিতে তো পারে না, তাহার নিজের মৃত্যুই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসে! তাই মনে হয় পশ্চিম পাড়ার

দুর্দ্দশা যত বড়ই হোক, সে সত্যকে গোপন করে নাই; ব্যাধি তাহার কি এবং কোথায়, তাহা বুঝিতে গোল হয় না।

জীবন সম্বন্ধে, নর-নারীর মিলন সম্বন্ধে সে কি সত্য প্রচার করিতেছে? বিবাহকে সে সোজাসুজি কামের ভিত্তিতে স্থাপন করিতে চাহিয়াছে এবং যখন সঙ্ঘাত এবং গোলমাল দেখা দিয়াছে তখন তাহাকে সে ঢাকা-চাপা দিবার ব্যবস্থা করে নাই। আজও সমূহগত ভাবে জীবনের ক্ষেত্রে প্রেম যে জাগ্রত হয় নাই এই সহজ সত্য কথাটিই পশ্চিমের জীবন অকুণ্ঠিত ভাবে বেদনাভারাতুর কণ্ঠে প্রচার করিতেছে। আর আমাদের আত্মপ্রসাদ-পরিতৃপ্ত চিত্ত এই সত্যটিকে গোপন করিয়া মিথ্যা বলিতে বলিতে নির্জ্জীব হইতে নির্জ্জীবতর হইয়া যাইতেছে।

সে কথা যাক্। কি পূর্ব্বে কি পশ্চিমে কোথাও সাম্যের আদর্শে, প্রেমের ভিত্তিতে সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই। ভবিষ্যযুগের নব্য সমাজতান্ত্রিকের হাতে সেই নব-সমাজতন্ত্র সৃষ্টির ভার রহিয়াছে। নব-সমাজতন্ত্র বিবাহ-ব্যবস্থাকে কি ভাবে রূপান্তরিত করিবে তাহার কথা এখন বলা অসম্ভব; কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থায় যে-সব মিথ্যা ব্যাপার চলিতেছে তাহাকে যে নব-ব্যবস্থা বর্জ্জন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

১০

প্রথমেই বলিয়াছি যে প্রেমের ভিত্তি সাম্যবাদের আশ্রয়। সুতরাং ভবিষ্যতের বিবাহ-ব্যবস্থায় নর-নারী উভয়েরই সমান মর্য্যাদা থাকিবে। আজ যেখানে কন্যাকে অর্থ দিয়া গ্রহণ করা হয় সেখানেও কন্যাপক্ষ আপনাকে অনুগৃহীত মনে করিয়া থাকে; অথচ এই যে বর্ত্তমান সমাজে বরপণ দিয়া বরকে ক্রয় করা হইতেছে, তাহাতে বরপক্ষ আপনাকে অনুগৃহীত মনে করা তো দূরের কথা, বিক্রীত হইয়াও বর কন্যার উপর পরম অনুগ্রহ করিতেছে বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ভবিষ্যৎ সমাজ এই মনোভাবকে ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর হইবে। প্রেমমূলক বিবাহে নর-নারী পরস্পরকে পাইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিবে।

আর যদি নর-নারীর মধ্যে মিলনের গ্রন্থি সত্যই পড়ে তাহাকে জন্ম-জন্মান্তরের মিথ্যা ভীতি কিম্বা আশ্বাস দিয়া দৃঢ় করিবার কোনো প্রয়োজনই থাকিবে না। আর যদি কামজ মিলনের মধ্যে প্রেম এবং পারস্পরিক কল্যাণ কামনা নাই জাগে তাহা হইলে সেই সব বিবাহকে চুকাইয়া দিতেও সমাজের কোনো লজ্জার বাধা থাকিবে না। অবশ্য সমাজ প্রত্যেক মানুষকে সামাজিক দায়িত্ব যথাযথ ভাবে স্বীকার করিতে বাধ্য করিবে এবং সেই দায়িত্বের অধিকারও নর-নারীকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে ভাগ করিয়া দিবে।

ভবিষ্যৎ সমাজ-ব্যবস্থাও মানব প্রকৃতির মধ্যে কাম প্রবৃত্তির প্রাধান্যকে স্বীকার করিয়া লইবে সত্য, কিন্তু তা বলিয়া বর্ত্তমান সমাজে শুধু নারীকে যেমন যৌন সম্বন্ধের অভিশাপ বহন করিতে হয় আর পুরুষ যেমন যৌন-সম্বন্ধের অযথা ব্যবহার করিয়াও বেশ নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে সমাজে চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, ভবিষ্যৎ সমাজ কখনো তাহা হইতে দিবে না। মানব-সমাজের সমূহগত এবং ব্যষ্টিগত কল্যাণকে—কেবল স্বার্থপর সুখ সুবিধাকে নহে—দৃষ্টি পথে রাখিয়া ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্র নর-নারীর বিবাহ-ব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিবে।

২৩শে পৌষ ১৩৩৩।

বিদায়-বাদল

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

সারা পথ মোরা কহি নি একটি কথা;
সাঁঝের আকাশে ছিল না ক' তারা,
বাদলের হাওয়া যেন পথহারা,—
ভিজাচুল সম চোখে মুখে লাগে
তাহারি সে সজলতা,
সারা পথ মোরা কহি নি একটি কথা।

আঁধারে আলোকে পথ চেনা গেল তবু;
ঘুরে গেনু কত নদীতট ধরি',
জলভারে সে যে উঠিছে গুমরি',—
বুক ফুলে ওঠে, তবু করিল না
কলমর্ম্মর কভু!
ভাঙনের ধার, পথ চেনা গেল তবু।

ফোঁটা-ফোঁটা জল,—তেমনি খোঁপার ফুল
পথের কাদায় পড়িল ঝরিয়া,
পাছে পায়ে ঠেকে গেলাম সরিয়া,
ফিরিয়া চাহিতে হ'ল না সাহস
যদি হ'য়ে যায় ভুল,
কুড়ায়ে রাখিনি তার সে খোঁপার ফুল।

একবার শুধু থমকি দাঁড়ানু দোঁহে;—
অধরের কোণে মৃদু হাসি-রেখা,
আকাশেও দেখি ক্ষীণ শশিলেখা।
জানি না কেন যে সহসা এমন
ক্ষণিক স্বপন-মোহে
মুখোমুখি করি থমকি' দাঁড়ানু দোঁহে।

কোমল তৃণ যে বাজিল কাঁটার মত !
আবার নামিল নয়নে আঁধার,
বিজুলী ধাঁধিল এধার-ওধার !—
মরম বিঁধিল শাণিত ফলকে,
শোণিতে ভরিল ক্ষত,
আঁখির চাহনি বাজিল বাজের মত !

ভোরের বেলায় বাদল নামিল যবে,
ধারা-বরিষণে তিতিল যে দেহ—
আঁখির ঝরণা দেখিল না কেহ,
শেষ-ক্রন্দন-ধ্বনি যে তখন
ডুবিল মেঘের রবে,
দুই পথে দোঁহে ছাড়াছাড়ি হ'নু যবে ।

'বৎস-হারা কোন্ সাহারা—'

শ্রী প্রবোধকুমার সান্যাল

অতটুকু ছেলের জন্য এতখানি গোলমাল—কে জানিত !

কনক বলে, "আমার কি ! পেটের ছেলে ত' আর নয় !"

মুখ খিঁচাইয়া অধর বলে, "পেটের ছেলে নয় ! তা বলে ওটা ভেসে যাবে—বটে ? তুই না কর্ব্বি তোর বাবা মানুষ কর্ব্বে—জানিস্ ?"

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গিয়া কনক বলে, "ওঃ বড্ড লম্বা লম্বা কথা ! তবু রোজগার ক'রে খাওয়াতে হয় না !"

অধর তেমনি ভাবে বলে, "ভারি রোজগার করিস্ ! আমি করিনি ? আমার পয়সা দাঁতে ঠেকাস্ নি তুই ? ঘরে এনেছিলাম—তাই এত ফর্‌ফরানি !"

মুখ বাড়াইয়া কনক বলে, "ঘরে এনেছিলে ! নাই আনতে ? কে তোমায় আন্‌তে বলেছিল ? আমাব আর ভাত জুটছিল না—না ?—যাও তোমার ছেলে আমি পুষতে পারব না ।"

অধরের চোখ দুইটা জ্বলিয়া ওঠে, "কি বল্লি ?" বলিয়া উঠিয়া গিয়া সে কনকের চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া আনে ।

শক্ত হাতের একটি চাপড় রগে বসাইয়া দিয়া বলে,

"ছেলেটা ফেল্না—কেমন? মানুষ কর্ত্তে পার্ব্বি নি ত' বেরো—ঘর থেকে দূর হ'—!"

পিঠের উপর আর এক চড়!

এমন প্রহার কনকের সহিয়া গেছে। আর কিছু সে বলে না।

ঘরে উঠিয়া গিয়া একবার সে বাহিয়ে ফিরিয়া তাকায়। অধর তখন মুখ বিকৃত করিয়া জলন্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে।

ডান-হাতে ঝিনুকটা ধরে আর বাঁ-হাতে ছেলের ঘাড় ধরিয়া কোলের উপর বসাইয়া দোলাইতে দোলাইতে দুধ খাওয়ায়।

ছেলেটা কাঁদে।

"মরণ নেই? মর্না হতভাগা। এতলোকে মরে আর—" বলিয়া ত্রস্ত দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে তাকাইয়া দাঁতে দাঁতে চাপিয়া কনক বলে, "দুধ খাও ত'—সোনা আমার—মাণিক আমার!"

কিন্তু কেউ আসে না। তখন সে পুনরায় বলে, "না খাস্ ত' বয়ে গেল! বাঁচি তা হলে।"

আবার বলে, "চুলোয় যাওয়া হয়েছে। কেবল এয়ারকি দিতে যাওয়া বাতাসি আবাগির সঙ্গে—। আমি বটে জানি নি কিছু? বললে আবার রাগ হয়—"

ছেলেটাকে শান্ত করিয়া সে মাদুরের উপর শোয়াইয়া দেয়, তার'পর আস্তে আস্তে দরজাটি ভেজাইয়া বাহির হইয়া আসে।

আপন মনেই বলে, "কোন্ সোয়াগীর বংশ তার ঠিক নেই, যত গরজ আমারই। মরেও না—!"

গরগর করিতে করিতে সে বাহির হইয়া যায়।

ছোট-মাঠটুকু পার হইয়া গয়লা-বাড়ী।

তাহারই গোয়ালের দাওয়ায় উঠিয়া ঠন্ করিয়া হাতের ঘটিটা নামাইয়া কনক বলে, "পারি নাক' রোজ রোজ দুধ বইতে—!"

রতন দুধ দুইতে দুইতে ঘাড় ফিরাইয়া বলে, "কেন ব'স্ তুই?"

মুখ ঝাম্টা দিয়া কনক বলে, "তুই থাম্—তোর কথার দরকার কি? আমি ব'ই আমার খুসী—তোর কি?"

"আবার রাগও—আছে!" রতন হাসিয়া বলে।

কনক আপন মনেই গোঁজ্ গোঁজ্ করিতে থাকে।

থাকিয়া থাকিয়া রতন বলে, "আমার ওপর রাগ নাকি রে? বেশ—আমার ওপরেও রাগ!"

"তুই বটে পীর এসেছিস্—না?"

রতন আড়ে আড়ে তাকায়।

কনক বিরক্ত হইয়া বলে, "দুধ দে শিগ্গির! বসবার সময় নেই। হাটে যাবো একবার।"

রতন দুধের ঘটিটা নামাইয়া রাখিয়া বলে, "দুধ নিচ্ছিস্ দাম দিবি না?"

"না দোব না—পালিয়ে যাবো! যদি না দি—কর্ব্বি কি?"

রতন হাসিতে হাসিতে বলে, "অন্য লোক হলে কর্ত্তুম কিন্তু—" বলিয়া আবার সে হাসিতে হাসিতে তাহার ঘটিতে দুধ ঢালিয়া দেয়।

কনক বলে, "মরণ আর কি!—যা তোর দুধ দিয়ে কাজ নেই। ঢেলে নে—" বলিয়া নিজের ঘটিটা রতনের সুমুখে বাড়াইয়া দেয়।

রতন আবার হাসে, "আর কোত্থেকে দুধ নিবি তবে?"

"ওঃ—তুই কেবল একলা দুধ বেচিস্—না?"

"আমার মতন ত' কেউ অম্নি দেবে না!"

......ঘটি তুলিয়া লইয়া কনক চলিয়া যায়।

অধর বলে, "জামা নেই কেন? ছেলের গায়ে একটা জামা দিতে পারিস্ না?"

কনক বলে, "জামা বুঝি উড়ে আসবে?"

"আসবেই ত! ছেঁড়া কাপড়গুলো কি হয়? জামা সেলাই কর্ত্তে পারিস না?"

"না।"

মুখ ভেঙচাইয়া অধর বলে, "রাতের বেলা তবে বসে বসে কি করা হয়? রতনার ঘরে যাওয়া হয় বুঝি?"

কনক চোখ পাকাইয়া কি বলিতে যায় কিন্তু কিছুই বলে না। নীরবে আপনার কাজ করে।

অধর আবার বলে, "যেখানে খুসী যা। আমার দরকার নেই সে কথায়। ছেলের অসুখ হলে মোদ্দা তোর একদিন কি আমার একদিন!"

কনক আর চুপ করিয়া থাকিতে পারে না।

বলে, "ওঃ—আবার চোখ রাঙানি। এনে দাওনা দেখি ছেলের জামা! কত মুরোদ তোমার দেখিনা একবার!"

কি একটা অস্ফুট উক্তি করিয়া অধর ভাতের গ্রাস মুখে তুলিতে থাকে। খানিকক্ষণ পরে সে বলে, "রান্না হয়েছে না ছাই হয়েছে। না হুন—না ঝাল।"

"ওই জুটে যাক্ আগে।"—মুখ ফিরাইয়া কনক বলে।—"কত ধানে কত চাল তা কি আর জানে কেউ? এই মাগী আছে বলেই রোজ এঁটোহাত হচ্ছে।"

একটু থামিয়া আবার বলে, "তাও লবডঙ্কা। বাসি হাঁড়ি কাল থেকে আর চড়বেও না বলে দিয়ে গেলাম।"

ছোট ছোট চোখ দুইটা পাকাইয়া অধর বলে, "যাওয়া হবে কোথায় শুনি?"

"চুলোয়! আমার খোঁজ নিয়ে কার কি দরকার? বড্ড দরদ!"

খাওয়া শেষ করিয়া অধর বলে, "দরদ না ছাই! বেড়াল কুকুরেরও লোকে খোঁজ নেয়। কিন্তু ছেলের যদি হাঁচি কাশি কিছু হয় ত' বুঝে নেবো তোকে। যাওয়া তোর ঘুচিয়ে দেবো—তা বলে দিচ্ছি।"

মাথা দোলাইয়া কনক বলে, "তোমার ছেলে তুমি বোঝো গে—আমি ওকে দেখতে পারব না। ভাল লাগে না আমার।"

"এঃ ভাল লাগে না! রতনার গোয়ালটি কেবল ভাল লাগে—নয়?"

কনক সে কথার উত্তর না দিয়া বলে, "হারালে কাঁদতে নেই—ম'লে খুঁজতে নেই! ছেলে!—ছেলে আমার কি হবে শুনি? তবু যদি পেটের ছেলে হত!"

অধর আর কিছু বলিবার প্রয়োজন বোধ করে না।

কনক আবার বলে, "সারাদিন উনি এয়ারকি দিয়ে বেড়াবেন—তামাকের আড্ডায় গিয়ে বসবেন—আর আমি রোজগার করে মরব—ছেলে মানুষ কর্ব্ব—কেমন? এমন কল্লে আর চলবে না। ঝাঁকা মাথায় করে হাট-ঘর আর আমি পারি না। এতটুকু ফাঁক কি পাব না আমি?"

বলিতে বলিতে তাহার গলা ধরিয়া আসে। অধর তখন কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে মুখ খিঁচাইয়া একটু একটু হাসিতে থাকে।

কিন্তু কাজের ছুটি কনকের নাই। সকাল বেলায় দুধ খাওয়াইয়া ছেলেটাকে রতনের ঘরে তরঙ্গিনীর কাছে জিম্মা রাখিয়া তাহাকে হাটে যাইতে হয়। যাইবার সময় বলে, "দেখিস্ ভাই। কাঁদলে একটু কোলে-টোলে নিস্। তুইও ত ছেলের মা!"

রতন হাসিয়া বলে, "তুই বুঝি ছেলের মা নয়?"

আড়চোখে তাহার দিকে তাকাইয়া কনক বলে, "তোর কেবলই তামাসা আমার সঙ্গে! যা তুই—বুড়ো ধাড়ি কোথাকার!"

রতন বলে, "কার সঙ্গে তবে তামাসা করব?"

"আ-মর্।" বলিয়া মাথায় ঝাঁকাটা তুলিয়া লইয়া কনক চলিয়া যায়।

আবার একবার ঘুরিয়া আসিয়া বলে, "তরি?"

তরঙ্গিনী বাহির হইয়া বলে, "কি রে?"

"ছাখ্"—বলিয়া কনক একটুখানি চুপ করিয়া বলে, "কাঁদে যদি ছেলেটা, তবে এক কাজ করিস্ ভাই—তোর ছেলের ঝুমঝুমিটা ওর হাতে দিস্—বুঝলি?"

"আচ্ছা—আচ্ছা। যা তুই।"

"আর গায়ে যদি মশা-মাছি বসে তবে একটু তাড়িয়ে তুড়িয়ে দিস্ ভাই।"

তরঙ্গিনী ততক্ষণে চলিয়া গেছে।

রতন বলে, "ভাইনের মায়া নাকি রে ?"

"মুখে আগুন তোর !" বলিয়া কনক বাহির হইয়া যায়।

এঁটেলা-মাটির উঁচু নীচু সঙ্কীর্ণ রাস্তায় চলিতে চলিতে সে হাঁপাইয়া ওঠে। গায়ে রৌদ্র আসিয়া পড়ে।

ঝাঁকাটা এক জায়গায় নামাইয়া সে কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলে। তারপর আপন মনেই বলে, "এত করে গালাগাল দিলাম—ম'ল না।......থাক্, মরে কাজ নেই বাপু। মলেই ত ফুরিয়ে গেল !"

আবার বলে, "কাল থেকে সঙ্গে করেই আন্‌ব বাপু! তরি হাজার হোক্—পর ত'! ককিয়ে কাঁদলে হয়ত শুনতেই পাবেনা। এক যন্ত্রণা হয়েছে !"

ছোট ঝাঁকাটি আবার মাথা তুলিয়া লইয়া সে চলিতে থাকে।

বাঁক ফিরিয়া সহরে যাইবার রাস্তাটি মেলে। রাস্তাটি পাকা।

মেটে রাস্তাটি সমানে জঙ্গলের ভিতর দিয়া দূরে গিয়া মিশিয়াছে। নূতন খালের একেবারে ধারেই।

পাকা-রাস্তা বরাবর হাটে যায়।

হাট খুব বড় নয়। মহাজনদের তরি-তরকারীর গাড়ী এদিকে আসে না। ফড়েরা অল্প-সল্প মাল আনিয়া বিক্রয় করে।

খদ্দেরের ঝুঁকতি কনকের দিকেই যেন একটু বেশী। অনেকে তাই ঠাট্টা করে। বলে, "বয়স অল্প কিনা—"

নটবর আড়ে আড়ে তাকাইয়া হাসে।

"কুলি বেগুন আনিস্ নি, কন্‌কি ? ছুটো খদ্দের তোকে দিতে পার্তাম'মাইরি !"

সহিয়া সহিয়া কনক একবার বলে, "অত দয়ায় কাজ নেই তোর !"

"কার দয়া চাস্ তবে ? ওই রমনার ? না—পটুলার ?"

অনেকেই এমনি বিরক্ত করে। কনক কিছু বলে না। এক্‌লা মানুষ এতদূরে আসে!—কাহাকেও কিছু বলিতে সাহস হয় না।

ট্যাপ্‌রা-পানা মাগিটা বলে, "আগে কোথায় মাল বেচ্‌তিস্ লা ?"

"কোথাও না।"

"ও! নতুন ব্যাব্‌সা ফেঁদেচিস্ ? তা শোন্—দর যেন কমাস্‌নে বাছা। খদ্দেরের ঝুঁকতি একপেশে ভাল নয়—ওতে বাজার খারাপ হয়ে যায়—বুঝলি ?"

"জানি গো জানি।" কনক বলে।

নটবর বলে, "খুব চড়া চড়া দর বলিস্।"

সকলে হাসে।

ট্যাপ্‌রা-মাগি সরিয়া গিয়া বলে, "যে শাস্ত ! কারবার চলে না ও-হতে। বড় নাজুক ছুঁড়ি।"

বেলা-বেলি হাট ভাঙ্গে। বড় বড় চেঙারি হইতে সকলের মালই ক্রমে ক্রমে ফুরাইয়া যায়। ট্যাঁক হইতে লম্বা বগ্‌লি বাহির করিয়া সকলেই পয়সার হিসাব করিতে বসে।

কনক সব মাল কিন্তু কাটাইতে পারে না।

একদরে হাটের মাল অচল। কিন্তু দর কমাইতে গিয়া অন্যের বিষ-নজরে পড়িলে হাটে বসা দায় হইবে। অথচ ওরা দর টিপিয়া কসিয়া মাল ছাড়ে।

রাগে তখন গোঁজ হইয়া বসিয়া থাকে।

বেলা যখন প্রায় ঢলিয়া পড়ে তখন সে একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। দু'তিনটা দোকানদারকে ডাকিয়া কেনা-দরে অবশিষ্ট মালগুলি ছাড়িয়া দেয়। সব মিলাইয়া লাভ আর প্রায় থাকে না।

খালি চেঙারিটি হাতে লইয়া যখন সে ফিরিবার পথ ধরে তখন সারাদিনের শ্রান্তিটা জোয়ালের মত তাহার কাঁধে চাপিয়া ধরে।

সুমুখের নির্জ্জন দীর্ঘ পথের দিকে একবার চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়, তারপর ধীরে ধীরে একটা মুড়ির দোকানের দিকে অগ্রসর হইয়া যায়।

মুড়ি লইয়া বাউরী-পুকুরের পাড়ে আসিয়া বসিতেই সন্ধ্যা হইয়া আসে। দূরে ময়দার কলে সারি সারি আলো জ্বলিয়া ওঠে।

আর তাহার খাওয়া হয় না। মুখে চোখে জল দিয়া উঠিয়া আসিয়া বলে, "থাক্—খাওয়া ত' আর বড় নয়। ছেলেটা এতক্ষণ কান্না নিয়েছে কিনা কে জানে!"

পথে নামিয়া আবার সে চলিতে থাকে।

মা-মরা ছেলেটা দিনে-দিনে বাড়িয়া ওঠে। খাইতে শিখিয়াছে। রত্নের কাছে বিনা পয়সায় কনক আর দুধ লয় না।

বলে, "গতর আছে যদ্দিন খেটে খাওয়াবো। পরের দয়া নেবো কেন?"

অধর বলে, "মূলধন ত কমে এল! রস যোগাবে কে?"

—"যেই যোগাক্! তুমি ত' আর নয়!"

মুখ সিঁটকাইয়া অধর বলে, "বড্ড বড়াই—দেখা যাবে!" বলিয়া চলিয়া যায়।

আবার ঘুরিয়া আসিয়া বলে, "তামাক কই? তামাক আনিস্‌নে?"

"তামাকের পয়সা কই?"

—"কই তা আমি কি জানি? আনিস্‌নে কেন তুই? পেট ফুলে যে আমার ঢাক হ'ল, হতভাগি!"

কনক রাগিয়া বলে, "ঢাক্ হোক্ ঢোল হোক্ আমি জানি নে। পয়সা অত সস্তা নয়।"

পরদিন যথা সময়ে যথা স্থানে তামাক দেখিতে পাইয়া অধর বলে, "ছ্যাঁচড়া কিনা? ভাল কথায় গা করে না।"

আবার বলে, "না দিলে রক্ষে ছিল? জুতিয়ে হাট্ করে দিতুম না?"

রাতের বেলায় অধর কোনোদিন ঘরে থাকে—কোনোদিন থাকে না।

যে দিন আসে—নিজের ঘরটি সে দিন দখল করিয়া থাকে।

ভাল ঘর ঐ একটি! আর একটি আছে—তার কিন্তু দরজা জানলা কিছুই নাই।

কনক বলে, "ও ঘরে ছেলে নিয়ে শোবো—ঠাণ্ডা লাগবে না? তোমার ঘরটিই ছেড়ে দাও না!"

"অত সোহাগে কাজ নেই!" অধর বলে।

"তবে এক ঘরেই সকলে শুই!"

"না—না। আর এক ঘরে শুতে হবে না। বড্ড ইয়ে। রাতের বেলায় ছেলের প্যান্‌প্যানানি—তারপর? ঘুমের ব্যাঘাত হলে?"

কনক আর কিছু বলে না। ছেলেটাকে কোলে করিয়া পাশের ঘরে গিয়া ঢোকে। আপন মনে বলে, "যমের অরুচি!"

খানিকক্ষণ বাদে দোরের কাছে দাঁড়াইয়া আবার বলে, "ভোর রাতে তবে ছেলেকে একটু কোলে নিয়ে থেকো। আমি মাল কিন্‌তে যাবো যে!"

বিকৃত মুখে অধর বলে, "কেন—ছেলেটাকে কোলে নিয়েই যাওয়া যায় না? গতরে তোর ফোস্কা পড়ে বুঝি?"

হাটে যায় আসে।

পথের দোকান হইতে খাবার কিনিয়া আনে। ছেলেটা হাতে করিয়া খাইতে শিখিয়াছে।

কোনোদিন এটা-ওটা!

কোনোদিন একটা খেল্‌না—পেট-টেপা রবারের পাখী একটা!

টিপ্ কাজল পরাইয়া কোলে বসাইয়া আদরও হয়।

নস্তির-মায়ের সেই শোলকটি—

"যার ছেলে তার ছেলে নয়,
মানুষ করে যে তারই হয়—".

ছেলেটা তখন ছোট ছোট দাঁত বাহির করিয়া হাসে। আঙুল চোষে।

রতন বলে, "না বিইয়ে কানায়ের মা।"

কনক বলে, "তাইই ত? তোর চোখ টাটায় বুঝি?"

রতন এদিক ওদিক চাহিয়া বলে, "ছেলে পেয়েই সব চুকল নাকি রে?"

চোখ পাকাইয়া কনক বলে, "কি চুকল?"

—"এ—ই—" বলিয়া রতন হাসিতে থাকে।

তরঙ্গিনী বলে, "সতীন-পোকে এত দরদ?"

"সতীন থাকলে কি আর দরদ কর্ত্তুম?" বলিয়া কনক হাসিয়া হাসিয়া ছেলেকে দোল খাওয়ায়।

তরঙ্গিনী আবার বলে, "ছেলেটা বাতাসীর—তা জানিস্? বিরক্ত করে বলে তোর ঘাড়ে চাপিয়েছে?" বলিয়া সে হাসিতে থাকে।

কনক ছেলেটাকে কাঁধে করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলে, "যারই হোক ভাই! আমি ত মানুষ কচ্ছি?"

মুখ বাড়াইয়া রতন বলে, "দুধ নিবি নি আর? দুধ?"

কনক থমকিয়া বলে, "না।"

"ছেলে পেয়ে ভুললি নাকি?"

"কাকে?"

রতন হাসে।

কনক জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিয়া যায়। চুপ করিয়া তাহার পথের দিকে রতন নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। একটু খানি হাসেও।

হাতের কাজ করিতে আর তাহার মনেই থাকে না।

কথায় কথায় সেদিন ঝগড়া বাধিল।

অধর বলিল,, "গেল বছর বালা গড়িয়ে দিয়েছিলুম। দে আমার সে বালা ফিরিয়ে!"

"ওঃ! ফিরিয়ে দে!"—কনক গর্‌গর্ করিয়া উঠিল,—"কার ঘর থেকে দেবো শুনি?"

"আমি তার কি জানি? আমার বালা আমি চাই।"

"চাই বললেই ত হয় না! সংসার খরচটি চল্‌লো কি করে? বালা বেচে নয়? নিমুনে-রোগে তিনমাস ধরে ওষুধ জুগিয়েছিল—কে? মুখ নেড়ে আবার কথা!"

অধর চীৎকার করিয়া বলিল, "কে তোকে ওষুধ যোগাতে বলেছিল হারামজাদি?"

কনকেরও মাথার ঠিক ছিল না। বলিল, "দেখ গালাগাল যখন-তখন দিও না বলে দিচ্ছি! এক পয়সা আর আমি দিতে পারব না। যাও—যা খুসী তাই করগে—"

অধর খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া রহিল। তারপর বলিল, "সে দিনকে ছেলের দুধের তরে যে টাকাটা দিলাম তাও দিবি না বল্?"

"না, তাও দেবো না। ছেলে ত আমার নয়! দুধও আমি খাই —'

"তবে ধার নিলি ক্যান, হতভাগি?" বলিতে বলিতে অধর কাছে আসিয়া সবে একটি চাপড় বসাইয়া দিল।

ঠোঁটের উপর দাঁত চাপিয়া কনক বলিল, "মারো কাটো, তবু আমি সে টাকা দেবো না—"

"বেরো—তবে দূর হ! ঘর থেকে—" বলিয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া অধর হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিল।

ছেলেটা তখন দালানের উপর বসিয়া মায়ের নির্য্যাতন দেখিতে পাইয়া চীৎকার সুরু করিয়াছে।

অধর ফিরিয়া আসিতেছিল—কনক দ্রুতবেগে হঠাৎ আসিয়া ছেলেটার পিঠে একটা চড় বসাইয়া দিল। "আর কাঁদবি হতভাগা ছেলে! তোর জন্যেই ত—"

তাহার কথা শেষ হইল না। বাঘের মত অধর ছুটিয়া আসিয়া তাহার পিঠে একটা লাথি মারিল।

"ছেলের গায়ে হাত তুললি হারামজাদি? কার ছেলে জানিস্?"

আর এক লাথি!

কনক ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া একবার বলিল, "আমি গেলে চল্‌বে ত'? ছেলেকে রাখতে পারবে?"

চোখে তাহার দুই ফোঁটা জল তখন পরিপূর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

অধর তাহার কথার জবাব দিল না।

রতন বলে, "মার খেলি—গাল খেলি, আমি ত' বলেছিলাম কনক!"

কনক বলে, "থাম্ বাপু তুই—যখন তখন হিত্‌কথা শুনোসনি—।"

তরঙ্গিনী তাহার মাথার খোঁপা বাঁধিয়া দিয়া বলে, "থাকুক্ ও বাতাসিকে নিয়ে—তুই আর ওর ঘরে যাস্‌নে। ছেলের ওপর অত দরদ কিসেব? উড়ে এসে জুড়ে বসেছে!"

তরঙ্গিনী আবার বলে, "থাক্ ওই ঘরটায়। ভাড়া আবার তুই কি দিবি? পুষ্যিও তুই কারো নস্—তবে? গতর আছে—হাট করবি খাবি দাবি। থাক্। ছেলেটার তরে মন খারাপ হয়—একবার অমনি গা-ঢাকা দিয়ে নজর করে আসবি!"

কনক মাথা দোলাইয়া বলে, "কেন যাব? আমার কি দরকার? ওর ছেলে ও যা খুসী করুক। ছেলে ত আর আমার নয়—না কি বলিস্?"

রতন সে কথার উত্তর দেয়, "তাইত বলেছিলাম তোকে!"

হাসিতে হাসিতে রতন আবার বলে, "ছেলে নিয়ে যে কাণ্ড কল্লি—দেখে ত' অবাক!"

তরঙ্গিনী বলিল, "এক গাছের ছাল কি আর গাছে জোড়া লাগে?" বলিয়া নিজের কাজ করিতে চলিয়া যায়।

কনক চুপ করিয়া থাকে।

রতন এদিক-ওদিক চাহিয়া বলে, "কনক?"

মুখ তুলিয়া কনক বলে, "কেন?

রতনের কথা আট্‌কাইয়া যায়। অন্যদিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করে।

গলা ঝাড়িয়া সে বলে, "অধরের ঘরে আর যাবি না ত?"

"তোর কি?"

"না—তাই বলছি। আচ্ছা, এর পর কি কর্ব্বি?"

"সে আমি বুঝব। তুই যা।"

রতন ভয়ে ভয়ে চলিয়া যায়।

দিন তবু কাটে।

রোজ রোজ হাটে আর কনকের যাওয়া হয় না। একটা ত মানুষ! যা' হোক করিয়া তাহার সংস্থান কি আর হয় না?

মূলধনও কমিয়া আসিয়াছে।

নিজের আনা-নেয়া নিজেই করে।

ঘরের সুমুখ দিয়া যাতায়াত করে।

আড়ে-আড়ে তাহার দিকে তাকাইয়া অধর তামাক টানে। দরজার গোড়াতেই সে বসিয়া থাকে।

বলে, "ক্যাব্‌লা কোথা গেলি—ক্যাব্‌লা?" বলিয়া সে ছেলেকে তুড়ি দিয়া ডাকে।

আহা! নাম-ডাকার কি ছিরি! কিন্তু কনক অন্যদিকে চাহিয়া চলিয়া যায়। যেন সে দেখিতেই পায় নাই।

ফিরিবার পথে আবার সে শুনিতে পায়, অধর বলে, "জামা নিবি না—রাঙা জামা? আমার ক্যাবল্‌মনি রে—" বলিতে বলিতে ছেলেটাকে কোলের উপর নাচাইতে থাকে।

আড়চোখে দেখিয়া কনকের সারাদেহ ঝিঁ ঝিঁ করিয়া

ওঠে। দাঁতে দাঁতে চাপিয়া আপন মনেই বলে, "যার চেয়ে মায়া বেশী—তারে বলে ডান্ !"

রাতের বেলায় হাসিয়া হাসিয়া রতন তাহার সহিত গল্প করিতে আসে।

বলে, "দিদি আজ সকাল সকাল ঘুমিয়েছে—এদিকে আসবে না।"

"ওঃ"

রতন আবার বলে, "হাটে যাস নি তুই আজ ?"

"উহুঁ।"

রতন এদিক ওদিক চায়। "একলা থাকতে তোর ভাল লাগে কনক ?"

"কাকে নিয়ে থাক্‌ব তবে ?"—বড় বড় চোখে আলোর দিকে চাহিয়া কনক বলে, "ছেলেটা ত' আর নেই !"

"পরের ছেলে না-ই বা রৈল !"

আগুনের শিখার মত হঠাৎ কনক জ্বলিয়া ওঠে, "আচ্ছা—তুই আমাকে এমন করে জ্বালাতে আসিস্ কেন বল্ ত ?"

রতন অন্ধকারে এদিক ওদিক তাকাইয়া তাড়াতাড়ি বলে, "তোর পায়ে পড়ি কনক—একটু আস্তে কথা বল্। কেউ শুনতে পাবে।"

"তবে যা তুই এখান থেকে—" কনক বলে।

"দুটো কথা কইতেও দিবি না ?"

মাথা ঘুরাইয়া কনক বলিয়া ওঠে, "আবার ?"

রতন তখন অন্ধকারে সরিয়া যায়।

চুপ করিয়া কনক বসিয়া থাকে। বাহিরে মানুষের সাড়া শব্দ তখন ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধ হইয়া আসে। জানলার বাহিরে অনেক দূরে একটা সরকারী আলো নজরে পড়ে।

সুমুখে মাঠের ও-ধারে নারিকেল গাছের মাথায় একটা চিল একঘেঁয়ে সুরে চীৎকার করিতে থাকে।

আস্তে আস্তে কনক বলে, "সুমুখ দিয়ে যাচ্ছি—ডাকা হল না একবার ! না ডাকলে ত' বয়ে গেল ! ওই ত'—ছেলেটা কদিনে আধখানি হয়ে গেছে ! কী এমন তোমার রাগ বাপু ? ছেলের মুখ চেয়েও ত মিটিয়ে ফেলতে হয়।"

আবার বলে, "রাগের মাথায় না হয় এক ঘা' মেরেইছি তাইতে এত ? মায়ে বুঝি ছেলেকে মারতে পারে না ?" বলিয়া অন্ধকারে এদিক-ওদিক তাকাইয়া পুনরায় বলে, "টাকাটা না হয় ফেলেই দিতাম। কিন্তু ও যতই দরদ দেখাক্ অতটুকু ছেলে সবই বুঝতে পাচ্ছে। কোলে নিতে দিলে না তা কি আর সে বুঝতে পারেনি ? খুব পেরেছে !"

এমনি সব কত কথা আপন মনে বলিতে বলিতে কনকের চোখে জল আসে।

"আচ্ছা তরি, বল্‌ত ! ছেলে কি ওর কাছে শান্ত হয়ে আছে ? কক্ষণো নয় !"

তরঙ্গিনী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসে।

"আমায় ছেড়ে একদণ্ড সে থাকতে পারে না !"

আবার বলে, "এক টাকার জন্যে এত রাগ ? না হয় দু'টাকা নিতিস্ ? তার জন্যে ছেলেকে শাস্তি দেয়া ?"

রতন তরঙ্গিনীর সঙ্গে চোখোচোখি করিয়া ঠোঁট উল্‌টাইয়া হাসে।

একটু থামিয়া কনক পুনরায় বলে, "শাস্তিই ত ! আমার কলা ! ছেলে নিয়ে তুই নিজেই ভুগবি !"

তরঙ্গিনী বলে, "ও আর কি ভুগবে ? রোগ হলে ফেলে পালাবে ! এই ত—আজ দুদিন হল ক্যাব্‌লার জ্বর, এক বড়ি ওষুধও খাওয়ায় না।"

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া কনক বলে, "অসুখ হয়েছে বুঝি ছেলেটার ?"

"হয়নি ? হবেইত—দেখবার লোক ত' ওই হাবাতেটা। দামেলে ছেলে, জল ঘাঁটে—উঠোনে হামা দেয়, ঠাণ্ডা লাগায়,—রোগ না ধরাই আশ্চয্যি !"

রতন বলে, "বুঝুক শালা এইবার ! বড় তেল্ হয়েছে !"

কনক উঠিয়া যাইতে যাইতে বলে, "ও আর কি ছাই বুঝবে? একফোঁটা ওষুধও দেবে না—কিচ্ছু না—"

কান্নায় তাহার গলা বুজিয়া আসে।

রোগ ভারি শক্ত!—রতন আসিয়া খবর দিল।

তরঙ্গিনী বলিল, "মার মতন যত্ন কচ্ছিল—হতভাগার প্রাণে সহ্য হল না! সাত দেবতার দোর ধরে তবে লোকের একটি ছেলে হয়—"

কনক হঠাৎ তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "একশ বার—ও-কথা তোরা কেন বলিস্ তরি, বল্‌ত?"

"না, তা-আমি' বলতে যাইনি, তবে দেখ্‌লি ত' কাণ্ডটা?" বলিতে বলিতে তরঙ্গিনী চলিয়া গেল।

রতন বলিল, "জ্বর একেবারে উপুড়-ধাপুড়। মুখে রা নেই।"

"আচ্ছা হয়েছে!" কনক আবার ধম্‌কাইয়া বলিল,—"শুভো খবরটি আমায় না দিলেই নয়! যা দূর হ!"

রাতের বেলায় রতনের দরজার কাছে আসিয়া কনক জিজ্ঞাসা করিল, "চোখ দুটি বুজে আছে নাকি রে?"

"হ্যাঁ তো—যেন শিবচক্ষু! দেখলে কষ্ট হয়!"

"কথা কইতে পাচ্ছে না? আমার নামও কচ্ছে না?"

"কথা কইতে পাল্লে ত!"

আপন মনেই কনক বলিল, "ঠিকই ত! কইতে পাল্লে কি আর আমার নাম কর্ত্ত না? ভেতরে ভেতরে কিন্তু নিশ্চয় আমার নাম কচ্ছে।"

রতন দোরের কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "ও নিয়ে আর ভেবে কি হবে কনক?"

"কি আর হবে!" কনক বলিল।

রতন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "ঘরে এসে একটু ব'স্।"

"বসব বৈ কি?" বলিতে বলিতে কনক জ্বলিয়া উঠিল, "এমন বিপদ মাথায় রেখে আমি বসে থাকি কেমন? তোদের কাছে আর কাল থেকে আমি থাকব না। আমার কি নিজের ঘর দো'র নেই?" বলিতে বলিতে সে অন্ধকারে বাহির হইয়া আসিল।

"কে রে?"

"আমি এলুম"—বলিয়া কনক আলোর কাছে সরিয়া আসিল।

ছেলেটা তখন অঘোর হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার দিকে একবার চাহিয়া অধর বলিল, "কে তোকে আসতে বলেছে? মজা দেখতে এসেছিস,—নয়?"

কনক বলিল, "একটা টাকার জন্যে এত কাণ্ড—এ কি ভাল?"

"থাক্। আর মাফিক্ কর্ত্তে হবে না। চলে যা তুই—দরকার নেই। আমার ছেলে আমি বুঝ্‌ব।"

"বুঝলে আর এমন অসুখ করে? আমি কারো মন্দ করি না!"

অধর উঠিয়া আসিয়া বলিল, "তুই এখন যাবি কিনা বল্?"

"থাক্‌তে কি আর এসেছি!—যাচ্ছিইত!" বলিয়া কনক নামিয়া আসিল। তারপর অন্ধকারে চোখ মুছিয়া বলিল, "দোষ কল্লে কি লোকে মাপ করে না?"

"না—করব না। তুই বেরো—।"

হাটের মাল সেদিন হাটেই পড়িয়া রহিল। একটা কিছুও বিক্রয় হইল না।

একে একে সকলেই হিসাব নিকাশ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। বাজরা পাতিয়া কনক কেবল একাই বসিয়া থাকিল।

ঝাড়ুদারেরা ময়লা সাফের জন্য জল ঢালিতে সুরু করিয়াছে।

তাহারই মত আর একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পচা একভাগা চিংড়িমাছ লইয়া এতক্ষণ বসিয়াছিল—ঝাড়ুদারকে দেখিয়া গামছার খুঁটে মাছগুলি বাঁধিয়া এইবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঘেয়ো কুকুরটা প্রতিদিনকার মত আজও যথাস্থানে আসিয়া বসিয়া আছে।

রোদের তেজ তখন কমিয়া আসিয়াছে।

একটা ছোট ছেলে অনেকক্ষণ ধরিয়া হেঁট হইয়া কি খুঁজিতেছিল। কনক বলিল, "কি রে ওখানে?"

ছেলেটার মুখখানা তখন কাঁদো কাঁদো হইয়া আসিয়াছে। বলিল, "পয়সা হারিয়েছে—একটা সিকি।"

"ও।—বাজার কর্ত্তে এসেছিলি বুঝি?"

রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "ঐ সিকিটি,—আর নেই কিছু!" আর সে বলিতে পারিল না।

কনকেরও আর শুনিবার প্রয়োজন ছিল না। চেঙারিতে আনাজপত্র গুটাইয়া একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বলিল, "আর একটু ব'স না তুমি। সিকিটা পেলে তোমার কাছ থেকেই—"

"বসবার আমার সময় নেই বাপু। কেমন আছে ছেলেটা কে জানে! ঘরে ফিরতে পাল্লে হয়!" বলিয়া কনক চেঙারি লইয়া বাহিরে আসিল।

চলিতে চলিতে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল—কি ভাবিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। ছেলেটা তখন ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে, আর সিকি খুঁজিতেছে।

আনাজ তরকারিগুলি একে একে তাহার কাছে নামাইয়া দিয়া কনক বলিল, "যা নিয়ে যা। সিকি আর খুঁজতে হবে না। এরপর পয়সা দিস্ দিবি—না দিস্ না দিলি—যা। তুলে নে সব।"

খালি চেঙারি হাতে করিয়া আবার সে রাস্তায় বাহির হইয়া আসিল।

একটি ছোট নূতন জামা হাতে করিয়া যখন সে ঘরে আসিয়া ঢুকিল—তখন বেলা অবসান।

দুই পায়ের হাঁটু অবধি রাস্তার ধূলা। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় চোখে আর কিছু দেখা যায় না। গলাটা শুকাইয়া একেবারে কাঠ হইয়া আছে।

ঘরে কারো সাড়াশব্দ নাই। রতন বোধ করি বাহিরে গেছে।

তরঙ্গিনীর দরজার কাছে আসিয়া মুখ বাড়াইয়া কনক দেখিল, ঘরের কোনে সে চুপটি করিয়া বসিয়া আছে।

"কি হল রে তোদের—সাড়া নেই কেন?"

তরঙ্গিনী নিরুত্তর।

"ভায়ের ওপর রাগ হয়েছে বুঝি?—হবারই কথা!" বলিয়া কনক চলিয়া যাইতেছিল—ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওদের আজ কাউকে দেখচিনে কেন রে? ছেলেকে একলা ফেলে বেরোনো হয়েছে বুঝি?"

রুদ্ধকণ্ঠে তরঙ্গিনী বলিল, "ছেলে তোর আর নেই কনক!"

"তা ত' নেই ভাই! তবু রোজ যদি একবার কোলে কর্ত্তে—জামা এনেছি দেখেছিস্—জামা?" বলিয়া সে সযত্নে জামাটি বাহির করিল।

তরঙ্গিনীর চোখে তখন জল দেখা দিয়াছে। সে বলিল, "ছেলে যে তোর মরে গেছে ভাই!—"

মৃত্যুরে কে মনে রাখে ?

শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

মৃত্যুরে কে মনে রাখে ?
—মৃত্যু সে ত মুছে যায়।
যে তারা জাগিয়া থাকে তারে লয়ে জীবনের খেলা
ভুবনের মেলা।

যে তারা হারাল দ্যুতি, যে পাখী ভুলিয়া গেল গান,
যে শাখে শুখাল পাতা
এ ভুবনে কোথা তার স্থান ?
নিখিলের ওষ্ঠপুটে ওষ্ঠ রাখি করিছে যে পান,
হে কবি আজিকে তার—
তার তরে রচ শুধ্ গান।

রচ গান যৌবনের।

যে প্রেমের চিহ্ন নাই লাজরক্ত কোমল কপোলে
কম্পমান হৃদ্‌পিণ্ডে দুর্ণিবার রুধিরের দোলে
তার তরে অকারণ শোক্।

বারবার ছেড়ে তার জীর্ণতা-নির্ম্মোক
জীবনের যাত্রা হেরি মহাকাশ ব্যেপে,
তারায় তারায় তার জয়ধ্বনি উঠে কেঁপে কেঁপে।
মৃত্যু-শোক-স্তব্ধ গৃহদ্বারে
আসে বারে বারে
সমারোহে শিশুর উৎসব,
বেদনার অন্ধকার বিদারিয়া প্রতিদিন দেখা দেয় প্রদীপ্ত গৌরব.
নির্লজ্জ শিশুর হাসি
কবরের মৃত্তিকায়, অবহেলি অশ্রদ্ধায়
তৃণে জাগে প্রাণ অবিনাশী।

ওরে ম্রিয়মাণ কবি উঠে বোস্ শোক-শয্যা তোল্
বন্ধুর বিরহ-ব্যথা ভোল্
কাণ পেতে শোন্ বসে জীবনের উন্মত্ত কল্লোল—
আকাশ বাতাস মাটি উতরোল আজি উতরোল। *

---

* অধুনালুপ্ত 'অতিথি' হইতে

বান-ভাসি

—পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর—

শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ধাক্কার পর ধাক্কা মারে—দরজা তবু খোলে না।

বলে, "ওগো—ওগো, খোলো খোলো! এদিকে যে সব গেল তোমার।" এতক্ষণে দরজা খোলে।

খোলে বটে,—

কিন্তু বোবা-মেয়ে কথা কয় না—এ বড় ঝকমারি!

মেয়েটি হেঁটমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

অবিনাশ আর কিছু না বলিয়া বাহিরে আসিয়া নিজেই রান্নার ব্যবস্থা দেখে।

মেয়েটি তখন আবার তাহার কাছে আসিয়া হাতের কাজ কাড়িয়া লয়। পোড়া ভাত ফেলিয়া দিয়া আবার নূতন করিয়া ভাত চড়ায়।

কিন্তু রান্না শেষ হইতেই বেলা প্রায় গড়াইয়া আসে।

ঘরের মেঝের উপর আঁচল দিয়া জায়গা ঝাড়িয়া ধোয়া শাল পাতার উপর ভাত ঢালিয়া মেয়েটি অবিনাশকে প্রথমে খাওয়ায়, তাহার পর অত্যন্ত সন্তর্পণে উনানের কাছে বসিয়া নিজেও চারটি মুখে দেয়।

অবিনাশকে কিছুই আর বলিতে হয় না।

খাওয়া-দাওয়ার পর অবিনাশ খাটের উপর বসিয়া বসিয়া বিড়ি টানে, আর জানালার বাহিরে একদৃষ্টে তাকাইয়া কি যেন ভাবে।

বোবা-মেয়েটি ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়ায়।—হাত হইতে টানিয়া টানিয়া সোনার চুড়ি কয়গাছি খুলিতে থাকে।

অবিনাশ অবাক্ হইয়া কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলে, "কি হবে ও? খুল্‌ছ যে?"

কিন্তু কে-ই বা বলে, আর কে-ই বা শোনে!

চুড়িগুলি অবিনাশের হাতের কাছে নামাইয়া দিয়া মুখ তুলিয়া মেয়েটি একটুখানি হাসে; ইসারা করিয়া বাহিরের দিকে দেখাইয়া দেয়,—এ ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র কোথাও চলিয়া যাইতে বলে।

হাসে, কিন্তু মুখের উপর কেমন যেন ব্যথার ছায়া পড়ে। বড় বড় টানা টানা চোখ দুইটি মনে হয় যেন চক্ চক্ করিতেছে।

কাঁদে নাকি?

টস্ টস্ করিয়া দু'ফোঁটা জলও গড়াইয়া পড়ে!

অবিনাশ ভাবে, একি!

নিশ্চয়ই কিছু হইয়াছে! কিন্তু কি হইয়াছে, কেন কাঁদে,—কেই বা তাহার জবাব দেয়?

বিড়ি খাওয়া অবিনাশের আর হয় না। জ্বলন্ত বিড়িটা সে জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

বাহিরে আসিয়া দেখে,—সন্ধ্যা তখনও হয় নাই; বাংলো-ঘরের বিজ্‌লী বাতিগুলা জ্বলিতেছে।

সাহেব ফিরে নাই।

বাবুর্চ্চি খানসামাগুলা ঘোরা-ফেরা করে।

অবিনাশ ঘরে ঢুকিয়া হাতের ইসারায় মেয়েটিকে ডাকে। বলে, "এসো তবে, আর কেন?"

সোনার চুড়িগুলি তাহার হাতে ফিরাইয়া দেয়,—পরিবার ইঙ্গিত করে। কিন্তু চুড়িগুলি সে হাতে না পরিয়া খুঁটে বাঁধে।

জিনিসপত্র যাহা কিছু বাজার হইতে আনা হইয়াছিল ঘরেই সব পড়িয়া থাকে।

অবিনাশ ঈষৎ হাসিয়া মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া আবার সেই পথে আসিয়া দাঁড়ায়।

আবার সেই পথ...

একা ত সে বেশ ছিল,—বেশ থাকিত!

এ বিপদ কেন যে সে সাধ করিয়া সঙ্গে আনিল কে জানে! এখানে যে মেয়েটির কি হইয়াছে, কেন কাঁদিল, কেনই বা সে এখানে থাকিতে চায় না, হাতের গহনা খুলিয়া দিবার অর্থ কি,—অবিনাশ মনে মনে তাহা বেশ ভাল করিয়াই বুঝে।

নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিবার জন্য প্রাণও কাঁদে,—আবার দোতলা বাড়ীর নীচে 'পানিও গিরে'......

মাথা বুঝি সবারই খারাপ হয়—।

হোক্ না বড়-সাহেব! জানোয়ার ত' নয়,—মানুষ যে! জানা কথা!

সুন্দরী সে কথা তাহাকে বেশ ভাল করিয়াই জানাইয়া দিয়া গেছে।

দূর ছাই! আবার সেই জঞ্জালের বোঝা বহিয়া তাহার লাভ কি?

পুরুষের দুর্দ্দমনীয় ভোগ-লিপ্সার খোরাক এই নারী!

একই কাঠাম্!

এও সেই তাহারই জাত—

সেই সুন্দরীর!

আবার সুন্দরীর কথা মনে পড়ে।

আবার অবিনাশ পিছন ফিরিয়া তাকায়।

বোবা-মেয়েটি তাহার পিছু পিছু চলে।

* * *

আশ্রিতা এই নারী—

কোথায় তাহাকে ফেলিয়া দিবে?

দস্যুর হাতের কাছে লোভনীয় লুণ্ঠনের বস্তু ফেলিয়া দিতে লজ্জা করে। অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে হয়। অপরাধ হোক্ আর না হোক্,—কোথায় যেন বাধে!

এই পাকা সড়কের উপর দিয়াই কলে যাইতে হয়। সুমুখে প্রকাণ্ড লোহার ফটক দেখা যায়। সাহেবের মোটর-গাড়ীটাও বুঝি এই পথ দিয়াই আসে।

অবিনাশ সে পথ ছাড়িয়া অন্য পথে নামে।

মাঠের পথ।

সাইডিং-লাইন্ পার হইয়া গয়লা-পাড়ার ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া টিকে-মহল্লার পাশে গিয়া ওঠে।

দূরে মাঠের মাঝে মিশ্‌নারী কুষ্ঠাশ্রম দেখা যায়।

সন্ধ্যায় তখন কে কার খবর রাখে!

অনেক ঘুরিয়া শেষে হাটতলায় হাজির হয়।

পথের পাশে দোকানে তখন আলো জ্বলে।

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করে, "রক্ষিত-মশাইএর ঘর কোন্‌টি বলতে পার ভাই?—খোঁড়া রক্ষিত মশাই?"

দোকানী হাঁ করিয়া মেয়েটির মুখের পানে চাহিয়া থাকে। প্রশ্নের জবাব দিতে একটুখানি দেরি হয়। বলে, "কি জানি মশাই!"

অবিনাশ আবার চলে।

আবার শুধায়।

একজন বলে, "পেরিয়ে এসেছ ভাই—"

আর একজন বলে, "এসো দেখিয়ে দিই।"

খানিক দূর সঙ্গে আসিয়া আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দেয়,—"সোজা এই পথের ধারে ডান-হাতি। ওই যে ওই ইঁটের পাঁচির..."

অবিনাশ ঘাড় নাড়িয়া বলে, "এবার ঠিক চিনে নেব। যান আপনি।"

লোকটা কিন্তু যায় না,—সঙ্গে-সঙ্গে গিয়া দরজা পর্য্যন্ত তাহাদের পৌঁছাইয়া দিয়া আসে।

বোধ হয় ভাল লোক!

রক্ষিত-বুড়া ভিতর হইতে সাড়া দেয়,—"কে?"

"আমি অবিনাশ।—সেই কারখানার সেই—"

"যাই—।"

কিন্তু যাই বলিয়াই চুপ!

বুড়া আর আসে না।

অবিনাশ মেয়েটিকে লইয়া দরজায় দাঁড়াইয়া থাকে।

ভিতর হইতে বুড়ার কথাবার্ত্তা শোনা যায়।—করুণ অনুনয়ের সুর!—

"দাও দাও, মরুকগে—তোমার পায়ে ধরি...দাও।"

নারী কণ্ঠে জবাব আসে—"দেব না বলেছি যখন তখন কে দেওয়াতে পারে! বুকে হেঁটে যাও না তুমি!"

বুড়া চুপি-চুপি কথা কয়, কিন্তু নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় দরজা হইতেও বেশ শোনা যায়—।

"তোমারই সেই লোক—আঃ! কি মনে করবে বল দেখি? দাও, দাও, ঠেঙ্গো দুটো দাও।"

বুড়ী বলে, "হোক্ আমার লোক। ঠেঙ্গো কেড়ে না রাখলে জব্দ হয় না মানুষ।"

অবিনাশের হাসি পায়। খোঁড়াকে জব্দ করিবার চমৎকার উপায়!

নিরুপায় অবিনাশ শেষে নিজেই বলে, "আমরাই যাব নাকি ভেতরে?"

বুড়া যেন এইবার একটুখানি কূল-কিনারা পায়। তাড়াতাড়ি বলিয়া ওঠে, "হেঁ হেঁ বাবা, এসো এসো ভাই এসো......দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আসবে অমনি।"

অবিনাশকে দেখিয়া বুড়ী একটুখানি পাশ কাটিয়া দাঁড়ায়।

বোবা-মেয়েটি কোথায় যাইবে ভাবিয়া একটুখানি ইতস্তত করে; বুড়ী তাহাকে ডাকিয়া লইয়া পাশের ঘরে গিয়া ঢোকে।

অবিনাশ ভাবে, তাহাকে বলিয়া দেয় মেয়েটি বোবা, কিন্তু বলিবার সুযোগ পায় না, বুড়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ওঠে, "কেমন বাছাধন, বলেছিলাম কি না—!"

অবিনাশ ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ হাসে।

বুড়া বলে, "হাতে ওটা কি তোমার? সেদিনেও দেখেছিলাম না?"

অবিনাশ বলে, "ও একটা যন্ত্র তৈরী করছিলাম বাঁশের—গোপীযন্ত্র। তার দিয়ে বাজাতে হয়।"

বলিয়া সেটা সে দরজার পাশে নামাইয়া রাখিয়া চুপ করিয়া বসে।

বুড়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে, "যাক্, তোমরাও বাঁচলে, আমরাও বাঁচলাম।"

বলিয়াই একটুখানি থামিয়া সে আবার বলে, "কেমন? এই ঘর—পছন্দ হয় ত!"

চমৎকার একতলা দালান-বাড়ী। নিরাশ্রয় পথিকের অপছন্দের কিছুই নাই।

বুড়া বলে, "হরিবোল! হরিবোল! এই বাড়ী-ঘর-দোর বিক্রি করে' ফেলব। পঞ্চাশ বিঘে জমি ছিল এখানে আমার, সব বিক্রি করেছি,—এও করব।"

তাহার পর সেই আদিমকালের কথা ওঠে। কেমন করিয়া কল হয়, কেমন করিয়া শহর বসে,—মিহিরপুর আগে কি ছিল, এখন কি হইয়াছে, কেমন করিয়া পথের উপর ইঞ্জিন চলে, আর কেমন করিয়াই বা তাহার পা

কাটে ;—এমন কি গয়লা-বুড়ীর মৃত্যুর কাহিনীটি পর্য্যন্ত বাদ পড়ে না।

অবিনাশ মন দিয়া শোনে।

বুড়া আবার বলিতে সুরু করে, "শ্বশুরবাড়ীর সম্পত্তি পেলাম, কিন্তু দেখবার শোনবার লোকের অভাব, তাই সেইখানেই যাব ভেবেছি।—তোমায় কি কি করতে হবে, তবে আগে থেকেই বলে রাখি শোনো। পিথম্ নম্বর কথা হচ্ছে,—এই বাড়ীর খদ্দের মাঝে-মাঝে আসে, আর না আসে ত' জুটিয়ে নিতে হবে। কিন্তু পাঁচটি হাজারের এক পয়সা কম হলেই তুমি ঘাড় নেড়ে দিও, বলো, হুকুম নেই। আর পাঁচ হাজারে যদি কেউ রাজি হয়, নিশ্চয়ই হবে,—বাস্, তৎক্ষণাৎ একখানি চিঠি—পানকিষ্ট রক্ষিত। রাঙামাটি পণ্ডিতপুর, জেলা বাঁকুড়া। ডাকঘর গাঁ—ওই একই,—রাঙামাটি পণ্ডিতপুর। একটি কাগজে বরং লিখে নাও,—লেখাপড়া জানো ত?"

অবিনাশ ঘাড় নাড়িয়া বলে, "জানি কিছু-কিছু।"

"বেশ, বেশ। আর দেখ, কিছু টাকা আমার এখানে পাওনা আছে। টিকে মহল্লায় সদু স্যাক্‌রার কাছে সাড়ে পাঁচ টাকা, আর বিন্দুমুখী বাগদিনীর কাছে দু'টাকা সাড়ে পনর আনা। লিখে নিতে হবে, মনে থাকবে না। টাকাটি পাবে কি অম্‌নি ঝাঁ করে' মুনি-অডার। বুঝলে? আর হ্যাঁ, তোমার এই বাড়ীর ভাড়া ধর গিয়ে—আচ্ছা তুমিই বল না, ন্যায্য ধরতে গেলে ভাড়া কত হয় তুমিই বল না ভাই!"

অবিনাশ বলে, "আমি যা দিতে পারি—তাই।"

"হ্যাঁ, তা বই-কি! দশ, আট,—যা পার। লোকসান ত' হয়েইছে, তা আর কি করি বল? হরিবোল! হরিবোল! ভাড়ার টাকাটাও মুণি-অডার করো মাসে-মাসে। ও আর ফেলে রেখো না, বুঝলে?—পিছু পড়লেই বাঘে খায়। মাসের পিথম্-দিকে হলেই ভাল হয়। তোমারও সুবিধে—আমারও সুবিধে। এই ত' কথা। শুনলে ত' বেশ মন দিয়ে সবগুলি? কাল আবার একটি কাগজে সব লিখে দেখ ভাল করে।"

অবিনাশ হাসে। বলে, "ভাড়ার কথা যা বললেন, তাই বা আমি দিই কোত্থেকে!"

বুড়াও হাসে। বলে, "কারবার কর। কাঠের কারবার একটি বেশ চলে এখানে।" একটুখানি থামে, থামিয়া বলে, "এই আমি বলে' দিচ্ছি শোনো,—টাকা গুলো এমনি বসে' থাকলে চুপ করে' থাকে, নড়ন্-চড়ন্ নেই,—যেন পাথর, কিন্তু কারবার-টারবার করলে ওর হাত-পা বেরোয়।"

অবিনাশ বলে, "জানি সব।"

বুড়া বলে, "জানো ত' আর দেরি কি? বৌকে আবার কত গয়না দেবে তুমি। এখন তোমার ওই সোণাই টাকা—টাকাই সোণা। সোণা আর টাকা একই কথা বাপ্!"

অবিনাশ মনে মনে হাসে, কিন্তু বোকার মত হাঁ করিয়া শোনে।

বুড়া বলে, "তা ধর—বন্দকী কারবার আমারও আছে। তবে বন্দকীতে আধাআধি, আর বিক্রি যদি কর ত'...... । তা বিক্রির চেয়ে আমি ত' বলি বন্দক থাকাই ভাল,—জিনিষটা আবার পাওয়া যায়; টাকৃতি দু'পয়সা মাসে,—এই ত' সুদ! ভারি ত' সুদ তার আবার কথা! বিয়ে-করা ইয়ে ত?"

অবিনাশ বলে. "আচ্ছা ধরুন, বিয়ে-করা যদি না-ই হয়।"

বুড়া হো হো করিয়া হাসে। খুশী যেন আর ধরে না। হাসি থামিলে বলে, "হেঁ-হেঁ বাবা, আমার আন্দাজ—ও একেবারে অব্যথ! ঠী—ক্ ধরেছিলাম! তা বেশ ত'—বেশ ত' তাতেই বা ক্ষতি কি? তাই বা ক'জন পারে বল ত? এ বাবা মারকে মার্—পাঁচসিকে গুণোগার! মেয়ে ত' মেয়ে—অমন মেয়ে, তার উপরে আবার গয়না!—তাই কর অবিনাশ, আমি তোমাকে ভাল বুদ্ধি দিলাম।"

বুদ্ধিটা অবিনাশ মনে-মনে যাচাই করিয়া দেখে আর হাসে।

বুড়া বলে, "ভাল করেছ—ও পাঁচভূতের আড্ডায় থাকনি, এ বরং দিব্যি আপনার নিরবিলি—কেউ জানবে না শুনবে না.....হ্যাঁ এই দেখ, কথায়-কথায় ভুলে যাচ্ছি,—তোমাদের খাবার?"

অবিনাশ ঘাড় নাড়িয়া বলে, "কিচ্ছু না। আজ বড় অবেলায় খাওয়া হয়েছে আমাদের।"

"না না তাই কি হয় কখনও? ওগো,—বলি ও ....."

ঠেঙোহীন বুড়া হাঁটিতে পারে না, সেইখান হইতেই বসিয়া বসিয়া চেঁচায়—"ওগো—বলি শুনছো, শুনছো? এদের খাবার—"

রান্নাঘর হইতে গিন্নির জবাব আসে,—"তুমি চুপ কর—ষাঁড়ের মত গলা নিয়ে আর.....আমি জানি,—তুমি চুপ কর।"

পরদিন সকালে কুয়ার কাছে বসিয়া অবিনাশ দাঁত মাজে, বুড়ী আসিয়া বলে, "আমরা আজই যাব বাছা, তুমি দুটি ভাড়ার গাড়ী এনে দিও, আর একবার খবর নিয়ে এসো নদীতে খেয়া চলছে কিনা।"

অবিনাশ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়ায়। বলে, "বেশ মা, যাব এক্ষুনি।"

বুড়ী একটুখানি কাছে সরিয়া গিয়া চুপি চুপি বলে, "গয়না-গাঁটি দিও না বাছা তুমি ওকে। বেটা ছেলে—যেমন করে' পার খেটে খেয়ো। সুদের দায়ে সব যাবে বাছা,—গেলে আর হবে না।"

বলিয়াই বুড়ী সেখান হইতে তাড়াতাড়ি পলাইবার চেষ্টা করে, পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলে, "শুদোয় ত' বলো—দেয় না কিছুতে। বলো যে ভুলিয়ে-ভালিয়ে যদি পারি নিতে, ত' দিয়ে আসব তোমাকেই।"

বুড়ী আবার যায়। আবার ফিরিয়া আসে। বলে, "ঘরের ভাড়া দিও দু' টাকা। যা পারো তাই দিও বাছা তুমি।"

বুড়ী আবার একবার উঁকি মারিয়া দেখে; বলে, "ছেলে নেই পুলে নেই—বুড়োর বিষয় খাবে কে বাছা! তবু জানবো যে ধম্মপুণ্যি হলো।"

বুড়ো কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ছাড়ে না।

নদীর ঘাটে গিয়া বলে, "কাগজটা রেখেছ ত ঠিক করে' অবিনাশ?"

অবিনাশ ঘাড় নাড়িয়া জবাব দেয়, "ভাববেন না কত্তা, ঠিকই আছে।"

"ঠিক্-ঠিক্ সব করো যেন—যা বললাম।"

অবিনাশ আবার ঘাড় নাড়ে।

এক নৌকা বোঝাই জিনিষপত্র চলিয়া যায়—

আর এক নৌকায় বুড়া-বুড়ী—আর রসদের প্যাটরা!

কাঠের সিন্দুকটি বুড়া কিছুতেই হাত-ছাড়া করিতে চায় না। কি জানি, ভরা নদী,—ডোবে যদি ত' সিন্দুক ধরিয়াই ডুবিবে!

নৌকা ছাড়িয়া দেয়,—বুড়া মুখ বাড়াইয়া বলে, "দেখো অবিনাশ, শেষে সবদিক খুইয়ো না বাবা,—যেও ঠিক্। মেয়ে মানুষ—দু'বার বলে' কয়ে দেখলেই......"

বুড়ী তাহাকে চোখ টিপিয়া চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত করে।

অবিনাশ প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেছে......

নদীর চরে দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া প্রণাম করিয়া বলে, "চলি মা তাহ'লে—।"

"হ্যাঁ বাছা যাও, ভাল করে' থেকো।"

অবিনাশ কাগজ-কলের পথ ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরে।

সাহেবী-পোষাক-পরা ক্রিশ্চান-ডাক্তার শহর হইতে বাইকে চড়িয়া কুষ্ঠাশ্রমে যায়। অবিনাশ দূর হইতে পথ ছাড়িয়া মাঠে গিয়া নামে।

......মেয়েটি যে বোবা, কই সে কথা ত' বুড়ী-মা একটি বারও তাহাকে বলিলেন না......! অবিনাশ সেই একই কথা সারা পথ ধরিয়া ভাবিতে ভাবিতে আসে।

ঘরের কাছাকাছি আসিয়া ডাক শুনিয়া অবিনাশ পিছন্ ফিরিয়া তাকায়। দেখে, সেই সাত-লড়্কার বাপ পেটমোটা চীনা-সাহেবটি ছুটিতে ছুটিতে তাহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

অবিনাশ থমকিয়া দাঁড়ায়।

ফু-চুন্ সাহেব হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলে, "আমাল্ নাইফ্!"

অবিনাশ বলে, "হ্যাঁ সায়েব, তোমার ছুরিটা আছে বটে আমার কাছে।—দেব এনে?"

হাঁ, না, কিছু না বলিয়াই সাহেব তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। কয়েক-পা আগাইয়া আসিয়া বলে, "হুঁয়াকা কাম্ ছোড়ি ডিলে টুং?"

অবিনাশ বলে, "হাঁ সায়েব, ছেড়ে দিলাম।"

সাহেব বলে, "ভেলি গুড্।"

বন্ধ দরজা কড়া নাড়িতেই ভিতর হইতে খুলিয়া দেয়।

অবিনাশ বলে, "দাঁড়াও সায়েব, এনে' দিই।"

সাহেবও পিছু-পিছু ভিতরে গিয়া ঢোকে, মুখ তুলিয়া হাঁ করিয়া হাতের ইসারায় বলে, "পানি ডে ডেও এক লোটা...ডিরিঙ্ক্..."

বলিয়াই সে রকের উপর থপ্ করিয়া বসে। বসিয়া এদিক্ ওদিক্ তাকায়......কিন্তু এ তৃষ্ণার্ত্ত অতিথিকে কিসে করিয়া যে সে জল আনিয়া দিবে অবিনাশ তাহাই ভাবে। ভাবিতে ভাবিতে রান্নাঘরের কাছে গিয়া দাঁড়ায়। ঘরে কিছু নাই জানিয়াও রান্নাঘরের শিকল খুলিয়া দু'হাত দিয়া কবাট দুইটা ঠেলিয়া দেয়। কিন্তু কবাট খুলিয়াই সে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে—রান্নার যাবতীয় আসবাব, থালা ঘটি বাটি, বুড়ী-মা তাহাদের জন্য সবই রাখিয়া গেছে।

ঘটি লইয়া অবিনাশ কূয়ার কাছে জল আনিতে যায়। দেখে,—

সদ্য স্নান করিয়া বোবা-মেয়ে তখন বাঁধানো কূয়ার মাথায় বসিয়া হেঁটমুখে চুল শুকায়, আর একপিঠ কালো-কালো কোঁকড়ানো চুলের উপর আঁকিয়া-বাঁকিয়া সুন্দর হাতের পাঁচটি সরু সরু আঙুল চলে। ঝালর-ঝাঁপা কালো-চুলের আড়ালে সুন্দর টুকটুকে মুখের খানিকটা দেখা যায়—আর লাল পাথরের একটি দুল যেন রোদের আভায় আগুনের মত ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতে থাকে!

অবিনাশের পা আর চলে না। একরাশ এই ছড়ানো রূপের সুমুখে মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তম্ভিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়ায়।

বোবা-মেয়ে টের পায় না,—পা টিপিয়া টিপিয়া অতি সন্তর্পণে অবিনাশ আবার সেখান হইতে ফিরিয়া আসে,—আবার রান্নাঘরে ঢুকিয়া কলসির জল গড়াইতে বসে।

জল গড়ায় আর ভাবে......

ভাবে, এই এত রূপ আর-একজনের ছিল।

চোখ দুইটাকে তাহার ঝল্‌সাইয়া পুড়াইয়া দিয়া সে আজ চলিয়া গেছে,—

তাহার বুক পুড়িয়াছে,—মুখ পুড়িয়াছে!

সে আজ কাহার ঘরণী কে জানে!

আবার দু'দিন পরে হয়ত সে তাহাকেও ছাড়িয়া যাইবে।

দর্প অহঙ্কারের বুঝি আর অন্ত নাই!

জল লইয়া অবিনাশ সাহেবের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে, "হাত পাতো সায়েব, মুখে তোমার আমি ঢেলে দিই।"

ফু-চুন্ সাহেব অঞ্জলি-দুই জল খাইয়া কদমফুলের মত পাকা চুলওয়ালা মাথাটি তাহার নাড়িয়া বলে, "বাস্—!"

হাত দিয়া জল খাইতে সে জানে না। জলে তাহার জামার আস্তিন্ ভিজিয়া যায়,—বাঁ-হাত দিয়া নিঙড়াইবার চেষ্টা করে, আর স্তিমিতপ্রায় চোখ দুইটি তুলিয়া আকা-বাঁকা তাকায়।

বলে, "টোমাল্ ওয়াইফ্.....?"

বুড়ার ভাব-গতিক্ দেখিয়া অবিনাশ একটুখানি রসিকতা করে। বলে, "চাই নাকি?"

বুড়া কি বুঝে কে জানে, ঘাড় নাড়িয়া বলে, "না, ভেলি গুড্!"

ক্ষুধায় তখন অবিনাশের পেট জ্বলে। তবু হাসে। হাসিতে হাসিতে বলে, "আজকার মত তুমি ওঠো সায়েব, আমি তোমার ছুরিটা এনে দিই—।"

ছুরি আনিবার জন্য অবিনাশ ঘরের দিকে যাইতে চায়, বুড়া নিষেধ করে, বলে, "নেহি নেহি, কাম টোমাল্ হোনে ডেও!"

বুড়া কিন্তু নড়িতে চায় না!

অবিনাশ নিজেই দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া বলে, "বেশ, তবে এসো।"

সাহেব এইবার উঠে, দরজার বাহিরে গিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু আবার ফিরিয়া তাকাইয়া বলে, "ফিন্ আয়েগা।"

তাহাকে বিদায় করিয়া অবিনাশ দরজায় খিল বন্ধ করে।

কূয়ার কাছে গিয়া দেখে,—বাটিতে তেল, বাল্তি-ভরা জল, মেয়েটি তাহার স্নানের সব জোগাড় করিয়া রাখিয়াছে।

একেবারে রাজার ঐশ্বর্য্য!

কিন্তু রাজার পরিধানের দ্বিতীয় বস্ত্রখানিও যে নাই! —স্নানের পর পরিবে কি?

মেয়েটি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারে, কূয়ার উপর তাহার শুকনো শাড়ীখানি দেখাইয়া দেয়।

বুড়ী-মা তাহার সাধ্য-ভোর দিতে কিছুই কসুর করে নাই।

যাবার সময় বলিয়া গিয়াছিল, "তবু জানবো ধম্ম-পুণ্যি হলো......"

কিন্তু পুণ্যলাভের তখনও কিছু বাকি থাকে।

অবিনাশের খাওয়া শেষ হইলে মেয়েটি তাহার আঁচলের খুঁট হইতে পনরটি টাকা খুলিয়া তাহার হাতের কাছে হাসিতে হাসিতে নামাইয়া দেয়।

"ভোজনের পর দক্ষিণা নাকি?"

অবিনাশ মুখ তুলিয়া চায়; প্রথমে তাহার হাতের চুড়িগুলি দেখে,—গলার হার, কানের দুল,—সবই ঠিক আছে......

বুড়ীর মুখখানি অবিনাশের মনে পড়ে!

বাজার হইতে ফিরিতে সেদিন অবিনাশের সন্ধ্যা হয়।

মেয়েটির জন্য লাল চওড়া-পাড় শাড়ী আসে একজোড়া, গামছা আসে নীল রঙের;—নিজের আসে ধুতি-গামছা, একটি গেরুয়া রঙের আল্খেল্লা, আর পায়ে বাঁধিবার একজোড়া ঘুঙুর!

গোপীযন্ত্রটাও তৈরী করিয়া আনে।

বোবা-মেয়ে বাজার দেখিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসে।

রাত্রে অবিনাশ সেদিন আর ঘুমায় না।

পাশাপাশি দু'টা ঘরে দু'জনের বিছানা—। অবিনাশের ঘরে সারারাত আলো জ্বলে। কাগজ পেন্সিল লইয়া কি যেন লিখিতে থাকে,—আর গুন্‌গুন্ করিয়া গান গায়।

পরদিন অবিনাশের যেন কোনো কাজেই মন বসে না; স্নান করে, খায়-দায়, ঘোরে ফেরে, আর আপনমনেই গুন্ গুন্ করে।

অবিনাশকে চেনা দায়—!

কোনোদিন দেখা যায় শহরে,—কোনদিন বা গ্রামে।

ছেলে-মেয়েরা খাওয়া-দাওয়া ভুলিয়া দলে দলে তাহার পিছু পিছু ছোটে,—ও যেন বশীকরণের মন্ত্র জানে!

পায়ের ঘুঙুর ঝুম্ ঝুম্ করিয়া বাজে, ভ্রমর-গুঞ্জনের

মত গোপীযন্ত্রের সুর ওঠে, অবিনাশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানান্ ভঙ্গী করিয়া নাচিয়া নাচিয়া গান গায়—

"কিছুদিন মনে মনে যতন করে
শ্যামের পীরিত রাখ্ গোপনে!
শ্যামকে যেদিন পড়বে মনে
চাইবি কালো মেঘের পানে—
রাই লো! যাবি উত্তরে যাবি,
সত্বর্ হবি, বল্‌বি আমি যাই দক্ষিণে!"

চমৎকার গায়!

যেমন চেহারা, তেম্‌নি গান, তেম্‌নি নাচ—!

ঘরের মেয়েরা ডাকিয়া ডাকিয়া গান শোনে। পয়সা দেয়—।

কত কথা জিজ্ঞাসা করে। বলে,

"বোষ্টমীকে একদিন সঙ্গে নিয়ে এসো বাবাজি!"

বাবাজী হাসে।

ছেলেরা বলে, "না, না, সেই গান—"

মেয়েরা শুধায়, "কোন্ গান বাবাজি?"

অবিনাশ বলে, "সে অনেক বড় গান মা! দামোদরের বান-ভাসি।"

মেয়েরা ধরিয়া বসে, "তা হোক্ বড়। আমরা তাই শুন্‌ব।"

"শোনো তবে—।"

অবিনাশ গান ধরিল।

সে এক ভারি মজার সুর—

—শোনো সবে সাবধানে হয়ে একমন,
সন তেরশ' তিরিশ সালে
দামোদরের বান
দু'পহর রাত্রিকালে।

দু'পহর রাত্রিকালে
কমলপুরে
প্রবেশিল বান—
বান দেখে যত লোকের উড়িল পরাণ
বলে, কি করলে হরি!

বলে, কি করলে হরি
ভেবে মরি
হয়ে ক্ষ্যাপার পারা,
গাছে উঠে দেখে বান, ছুটে তীরের পারা!
হট্টকীর বোষ্টম্‌রা—

হট্টকীর বোষ্টম্‌রা
হয়ে ছাড়া
বোষ্টমীর সঙ্গ
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে কোথায় শ্রীগৌরাঙ্গ!
এলো বান কুলেকুঁড়ি।

এলো বান কুলেকুঁড়ি
গুড়ি গুড়ি
বান প্রবেশিল,
গমের কুঁচুড়ি সব বানেতে ভাসিল
ভাসলো মহামায়া—

ভাসলো মহামায়া
ছেড়ে দয়া
শোনো তার রঙ্গ,
ক্ষ্যাপা হলো ক্ষ্যাপা মাগী পেয়ে বানের সঙ্গ!
এলো বান পঞ্চবটী।

এলো বান পঞ্চবটী
নিলেক্ লুটি

ভাঙলো রাজার গড়,
দুর্ দুর্ শবদে ভাঙে পাহাড় পাথর!
এলো বান চণ্ডীপুরে।

এলো বান চণ্ডীপুরে
বলব কারে
কলরব ধ্বনি—
বান দেখে যত লোকের উড়িল পরাণী
ভাসলো রাজপুত!

ভাসলো রাজপুত
যমের দূত
ফুলে হলো ঢাক্,
গুড়্ গুড়্ শবদে নদীর সে কি ভীষণ ডাক্!
গেল বান পরিৎপুরে।

গেল বান পরিৎপুরে
মিঞা-ঘরে
ভাই-সাহেবরা কাঁদে,
বদনা ভাসে টুপি ভাসে মুরগী পড়ে ফাঁদে।
বলে, আল্লা রাখো জান!

আল্লা রাখো জান্
মেহের বান্
সিন্নি দেবার কথা,
মধ্যি-বানে ভেসে যায় উচ্চে তুলি মাথা।
পালায় সব প্রাণের ভয়ে।

পালায় সব প্রাণের ভয়ে
বানের ডরে
ফিরে নাহি চায়।
কোলের ছেলে ভেসে গেল করে হায় হায়!
গলেতে দিয়ে বস্ত্র—

গলেতে দিয়ে বস্ত্র
জোড় হস্ত
দ্বিজগণে কয়—
রক্ষা কর মা গঙ্গাদেবী, হও মা সদয়!
হরির কি বিবেচনা!

হরির কি বিবেচনা
এতগুনা
মানুষ মেরে দিল।
গড়্গড়ার ঘাট আজ সতী-ঘাটা হলো
স্ত্রী-পুরুষে কত লোক গলা ধরে' মলো।
হয় ত বিধির লিখন!
—নইলে মরবে কেন?

নইলে মরবে কেন—
বিপদ হেন
হতে কি আর হয়?
কাগজ-কলের ঘাটে বান ধীরি ধীরি বয়।
লাগলো বোবা-মেয়ে!

লাগলো বোবা-মেয়ে
শুয়ে শুয়ে
চুড়ি ঝিন্ ঝিন্ করে।
আমায় দেখে মুখে তাহার কথা নাহি সরে।
হায় হায় কার ঘরণী!

হায় হায় কার ঘরণী
সোণামণি,
কাহার ঘরে আসে!
দেখে শুনে ক্ষ্যাপা ভোলা আপন মনেই হাসে!
হাসে আর কয় না কথা।

হাসে আর কয় না কথা,
বুকের ব্যথা
লুকানো কি যায় ?
বুকের বেদন বুকেই থাকে মুখে হাসি পায়,
এবার যে সাঙ্গ হলো !

সাঙ্গ হলো বানের কথা মরি হায় হায় !

মেয়েরা বলে, "আহা, বেশ গান !"

অবিনাশ হাসে।

দিন তাহাদের মন্দ চলে না।

কোনোদিন পাঁচ, কোনোদিন সাত, কোনোদিন দুই, কোনোদিন তিন,—যেদিন যেমন পড়তা।

সারাদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচিয়া গাহিয়া অবিনাশ ঘরে আসে। মেয়েটি তাহার আসিবার আশায় বসিয়া থাকে। জল দেয়, পান দেয়, কলিকায় তামাকও সাজিয়া আনিতে যায়, হাঁ হাঁ করিয়া অবিনাশ তাহাকে নিষেধ করে,—"না না রামঃ! খেতে দিই বলেই কি—"

অবিনাশ তামাক টানে আর ভাবে,—কোনও কিনারাই ত আজ পর্য্যন্ত তাহার সে কিছুই করিয়া দিতে পারিল না! তবে কি তাহারই কাছে সে...চিরদিনের মত...রহিয়া গেল নাকি ?

মেয়েটিরও ত কোনো আগ্রহই কোনোদিন দেখা যায় না। মনে হয়, বেশ আছে।

অবিনাশ অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে যখন-তখন তাকায় আর ভাবে......

সেদিন আবার সেই চীনা-সাহেবের সঙ্গে দেখা !

লোকটা প্রায়ই আসে।

ছুরিটি সে তাহার কবে লইয়া গেছে,—তবু আসিতে ছাড়ে না।

চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া থাকে, কখনও বা আবোল্-তাবোল্ বকে, এদিক-ওদিক তাকায়,—ছোট ছোট চোখ দুটি দিয়া কাহাকে যেন খোঁজে—!

বোবা-মেয়েটি নাকি ?

বিচিত্র কি ?

প্রাণকৃষ্ণ রক্ষিতকে অবিনাশ সেদিন একখানি চিঠি দিয়াছে।

ঘরের ভাড়া তিন মাসের দরুণ পনরটি টাকা আগেই পাঠানো হইয়াছে; সদু স্যাকরা আর বিন্দুমুখী বাগ্‌দিনীর টাকা আদায় হয় নাই,—তাহারা দিব-দিব করে কিন্তু দেয় না। বাড়ীর খরিদ্দার কেহ আসে নাই।

গয়ারাম মাড়োয়ারী কাহার কাছে খবর পাইয়া সেদিন নিজে আসিয়া হাজির! বলে, "বাড়ী আমি কিনব।"

অবিনাশ বলে, "বেশ ত'! কিন্তু দু' হাজারের কমে নয়।"

গয়ারাম বলে, "দু' হাজার! আচ্ছা, চলো বাড়ীটা ভাল করে' দেখাও আমাকে।"

গয়ারামকে বাহিরে একটুখানি অপেক্ষা করিতে বলিয়া অবিনাশ তাড়াতাড়ি ভিতরে আসিয়া দেখে, মেয়েটি তখন রান্নাঘরের মেজেয় বসিয়া বঁটুনা বাঁটিতেছে। বাহির হইতে শিকল টানিয়া রান্নাঘরের কবাট দুইটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিয়া অবিনাশ বলে,—

"আসুন, দেখবেন আসুন!"

ভিতরে আসিয়া গয়ারাম প্রত্যেকটা ঘর ঢুকিয়া ঢুকিয়া দেখে, কূয়ার কাছে কোমরে হাত দিয়া দাঁড়ায়, চোখ বুজিয়া কি যেন আকাশ-পাতাল ভাবে, তাহার পর এদিক-ওদিক বার-কতক্ ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া থামে।

অবিনাশ বলে, "ওটা রান্নাঘর। ও ত বাইরে থেকেই বেশ—হাঁ হাঁ করেন কি, করেন কি ?—"

কিন্তু নিষেধ করিতে-না-করিতেই দরজাটা সে তখন খুলিয়া ফেলে।

খুলিয়াই যে অপ্রস্তুত হইয়া সরিয়া যাওয়া,—তাও যায় না; বরং নির্লজ্জের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ঘরের ভিতর পর্য্যন্ত নজর চালায়—।

গয়ারামের দুর্ভাগ্য! এত করিয়াও অনাবৃত সুগোল সুন্দর দুইখানি হাত আর আল্তাপরা দু'খানি পা ছাড়া আর কিছুই সে দেখিতে পায় না।

অবিনাশ মনে মনে হাসে। বলে, "তারপর? হলো ত' দেখা?"

গয়ারাম ভাবে, বোকা লোকটা কিছুই বুঝিতে পারে নাই, তাই সে বাস্তবাটী বিক্রয়ের পাট্টা-কবুলতির যাবতীয় হিসাব-নিকাশ তাহার সেই পরম লোভনীয় স্থানটিতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মুখে-মুখেই করিয়া ফেলিতে চায়।

অবিনাশ বোকার মতই চুপ করিয়া থাকে। বাহিরের সদর দরজার দিকে খানিকটা আগাইয়া গিয়া বলে, "বলুন, এবার আপনি কি বলছেন বলুন!"

ভদ্রতা আর বুঝি থাকে না! একটিবার মাত্র আড়-চোখে তাকাইয়াই গয়ারামকে কুকুরের মত তাহার পিছু-পিছু চলিয়া যাইতে হয়।

ঘাড় নাড়িয়া বলে, "নাঃ! আড়াই হাজার টাকা—তাও বেশি হয়।"

অবিনাশ চুপ করিয়া থাকে।

গয়ারাম আর-একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখে। পথে নামিয়াও আর-একবার সে মুখ ফিরাইয়া বলে, "কি বলেন মাহাশয়?"

ঘাড় নাড়িয়া অবিনাশ একটুখানি হাসে। বলে, "আপনিও যা বলেন আমিও তাই। কিন্তু ও যে পরের জিনিষ!"

মেড়ো মাড়োয়ারী অতসব সূক্ষ্ম রসিকতা বুঝে না।

ধীরে ধীরে দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া অবিনাশ চলিয়া আসে।

এক-একদিন একঘেয়ে হইয়া ওঠে।

তিরিশ সাল একত্রিশে গিয়া পড়ে।

বান-ভাসির গান পুরানো হইয়া যায়।

অবিনাশ বহুদূর পর্য্যন্ত হাঁটিয়া চলে। দূরের গ্রামে গান শুনাইয়া পয়সা আনে। ভিক্ষার একটা ঝুলি করিয়াছে; দোরে-দোরে মুষ্টিভিক্ষাও পায়।

দিন যেন আর চলে না!

অবিনাশ শুক্নো নদীর ধারে গিয়া দাঁড়ায়। চরের বালি ধূ ধূ করে। গরুগুলা অতিকষ্টে বালির উপর দিয়া গাড়ী টানে। এ-পারের গাড়ী ও-পারে যায়—ও-পারের গাড়ী শহরে আসে। দিনান্তের সূর্য্যরশ্মি বালির উপর পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করে। অবিনাশ ভাবে, আবার বান হোক্, আবার সে গান বাঁধিবে।

গরুর গাড়ীর মত ছই-দেওয়া একটা দোতলা গাড়ী প্রকাণ্ড একটা উটে টানিয়া লইয়া যায়।—শহর হইতে বাঁকুড়া যাতায়াত করে। দিনের পর দিন শুক্নো নদী পার হইয়া বহুদূর প্রান্তরের পথ অতিক্রম করিয়া আর-কোনও জানোয়ার এই এতগুলি যাত্রী লইয়া নির্ব্বিঘ্নে যাওয়া-আসা করিতে পারে না, তাই এক বুদ্ধিমান মাড়োয়ারী এই উট-গাড়ীর ব্যবসা ফাঁদিয়াছে। মামলা-মোকর্দ্দমার জন্য জেলায় যাইতে ওই একটি মাত্র যাত্রী-গাড়ী—বহুদূর দূরান্তরের গ্রাম হইতে লোকজন আসিয়া এই গাড়ীর অপেক্ষায় পথের ধারে বসিয়া থাকে। দিনে যায়, আবার রাত্রে ফিরিয়া আসে। অবিনাশ এক-একদিন তাহার গোপীযন্ত্রটি হাতে লইয়া এইসব যাত্রীদের গান শোনাইবার জন্য নদীর ধারে বটতলায় গিয়া চুপ করিয়া বসে।···কত কথা তাহার মনে হয়। মনে হয়, বোবা-মেয়েটির গয়না বেচিয়া কাঠের একটা কারবার খুলিলে তাহাকে অনর্থক আর এই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। বুড়া তাহাকে ভাল পরামর্শই দিয়াছিল। এই কাঠের ব্যবসাদারী তাহার আর ভাল লাগে না।

নদীর ধারে মাড়োয়ারীদের ধরম্-শালায় অবিনাশ

মাঝে-মাঝে গিয়া বসে। সাধু-সন্ন্যাসীগুলা ছাই মাখিয়া ধুনি জাগায়। অবিনাশকে তাহারা দেহতত্বের গান করিতে বলে,—অবিনাশ গায়,

"ওরে নিঠুর গরজী,
তুই কি মানস মুকুল ভাজবি আগুনে?"

মাঝে-মাঝে তাহাদের কাছে সে পয়সার পরিবর্ত্তে প্রসাদ পায়।—গাঁজা টানে। গাঁজা টানিয়া এক-একদিন চোখ লাল করিয়া অবিনাশ বাড়ী ফেরে।

ফিরিবার পথে সেদিন দেখে, গয়ারাম তাহার বন্ধ-করা বাড়ীর দরজায় উঁকিঝুঁকি মারিতেছে।—যদি কোথাও কবাটের ফাটা-ফুটা কোনো ছিদ্রের পথে ভিতর পর্য্যন্ত নজর চলে...

অবিনাশকে দেখিয়া হঠাৎ সে অত্যন্ত অপদস্থ হইয়া পড়ে, মুখখানা তাহার দেখিতে দেখিতে লাল হইয়া ওঠে, কথা বলিবার আর পথ পায় না,—শেষে যা হোক্ করিয়া বলিয়া ফেলে, "দেখছিলাম......এই বাড়ী···ও···তুমি বুঝি বাইরে গিয়েছিলে?"

অবিনাশ ঈষৎ হাসে। হাসিয়া বলে, "এসো!"

দরজা হইতে গয়ারামকে সে পথের ধারে ডাকিয়া লইয়া যায়। বলে, "ওকে তোমার চাই? ও আমার বৌ-টৌ নয়। বল ঠিক্ করে'?"

আনন্দে ও ভয়ে গয়ারামের মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না, একটা ঢোক্ গিলিয়া ঘাড় নাড়িয়া সে তাহার সম্মতি জানায়।

অবিনাশ হাত পাতিয়া বলে, "কত টাকা দেবে দাও আগে, তারপর যাকগে না হয় তোমাকেই দিয়ে দেব।"

গয়ারাম তখন মরিয়া হইয়া ওঠে!

"টাকা? আমার কাছে এখন—" বলিয়াই সে তাহার ঝোলা-জামার পকেটে হাত দিয়া কয়েকটা নোট বাহির করিয়া গুনিয়া গুনিয়া দেখে; বলে, "পঁচাশ আছে।"

নোট কয়খানা হাতে লইয়া অবিনাশ তাহার ঝোলার ভিতর রাখিয়া দিয়া বলে, "আরও শত্-খানেক দিও।"

"বেশ"—বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া গয়ারাম এমনি ভাব দেখায় যেন এ টাকা তাহার কাছে কিছুই নয়।

অবিনাশ পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলে, "যাও, এবার ঘুমোওগে তুমি,—আবার এসো টাকা নিয়ে।"

কথাটা যেন কানে তাহার কেমন-কেমন ঠেকে, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলে, "ও কি রকম কথা হলো?".

অবিনাশ বলে, "কি রকম?"

"ওই যে ঘুম না...কি বললে?"

অবিনাশ হাসিয়া বলে, "ছেলেমানুষ কি না! ঘুমোওগে মানে আর-কোনও ভয়-ভাবনা নেই তোমার!"

মাড়োয়ারীর বিশ্বাস হয় না। বাঁ-হাতের তালুর উপর ডানহাতের আঙুল দিয়া লিখিবার ইঙ্গিত করিয়া বলে, "একটি কাগজে তোমায় লিখাপড়া করে' দিতে হবে কিন্তু!"

অবিনাশ বলে, "জরুর—! লেখাপড়া কেন,—রেজেষ্টারি।"

জ্যোৎস্না রাত্রে বাদল নামিয়াছে।

ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়ে, আর শন্ শন্ করিয়া বাতাস বয়।

এমন সুন্দর ঘুমাইবার রাত তবু অবিনাশের ঘুম আর আসে না।

উঠিয়া বসে। সশব্দে জানালাটা খুলিয়া একবার বাহিরের পানে তাকায়।—জলে জলে জ্যোৎস্নার রং ঘোলাটে হইয়া গেছে! আকাশ যেন কুয়াশায় ঢাকা।

আবার জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানায় গিয়া শোয়। কিন্তু থর্ থর্ করিয়া হাত-পা কাঁপিতে থাকে,—মনে হয় শীত করিতেছে! দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। ফোঁটা ফোঁটা জলের ছিটা গায়ে আসিয়া লাগে।

অবিনাশ একবার পাশের ঘরের পানে তাকায়। দরজা পর্য্যন্ত খানিকটা আগাইয়াও যায়। আবার ফিরিয়া আসে।

বাহিরে এই বাদলের মাতামাতি,—বোবা-মেয়ে বোধ করি তাহার কিছুই টের পায় না। বুঝি বা সে তখন নিশ্চেষ্ট ভাবে ঘুমাইতে থাকে।

পরদিন সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সারিয়া অবিনাশ বাহির হয়।

ছুটিতে ছুটিতে পথের উপর গয়ারাম তাহার পিছন্ ধরে, ঝোলায় এক টান মারিয়া বলে, "কই—?"

অবিনাশ তাহাকে যেন চিনিতে পারে না, বলে, "কি?"

গয়ারাম বলে "টাকা?"

অবিনাশ হাত পাতে। বলে, "দাও!"

গয়ারাম ঘাড় নাড়িয়া পূর্ব্বদিনের মত লিখিবার ইঙ্গিত করিয়া বলে, "আগে লিখাপড়া, তারপর—"

অবিনাশ চোখ পাকাইয়া বলে, "ভাগ্—!"

গয়ারাম চমকিয়া উঠে। বলে, "আচ্ছা, দেখেগা হাম্!"

অবিনাশ তাহাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে চলিতে বলে, "দেখো তুমি।"

গয়ারাম একেবারে বেয়াকুফ্ বনিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকায়।

সেদিন আর বাদল নয়—
কিন্তু জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।

আহারাদির পর পাশাপাশি দুই ঘরে দু'জনা গিয়া শোয়।

সেদিনও তেমনি······

অবিনাশ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া আসে। বন্ধ দুয়ারে ধাক্কা মারিয়া বলে,

"ওঠো ওঠো, ওগো—শোনো শোনো, খোলো শীগ্‌গির!"

দরজা খুলিয়া মেয়েটি একটুখানি পাশ কাটিয়া দাঁড়ায়।

আর কোনও কথা নয়। উন্মাদের মত অবিনাশ গিয়া তাহাকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরে।

হাত দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলিয়া ওঠে,—

"ছাড়ো—!"

বোবা-মেয়ে কথা কয়—!

অবিনাশ চমকিয়া ওঠে! হাত দুইটি তাহার শিথিল হইয়া আসে।

চম্‌কাইবারই কথা।

দরজার কাছে টানিয়া আনিয়া মুখখানি তাহার তুলিয়া ধরিয়া অবিনাশ একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে—সে, না আর-কেউ!

"চিনলে ত? আমি তোমার বোন্!"

"বোন্—!" অবিনাশের গলার আওয়াজটাও যেন কাঁপে!

মেয়েটি বলে, "তোমার সেই পিসির মেয়ে—পরী!"

ছেলেবেলায় তাহাকে সে কয়েকবার দেখিয়াছে। এতক্ষণে অবিনাশ তাহাকে চিনিতে পারে।

"পরী! তুই পরী?"

মুখ নামাইয়া পরী ঘাড় নাড়িয়া বলে, "হ্যাঁ—।"

"আমায় তুই চিনতে পেরেছিলি?"

এবারেও পরী ঘাড় নাড়িয়া বলে, "হ্যাঁ—।"

অবিনাশ বলে, "তবে এতদিন—"

"কথা কইনি তুমি চিনতে পারবে বলে'।"

দু'জনেই চুপ।

থানিক্ পরে অবিনাশ শুধায়, "পিসির বাড়ী ত' অনেক দূর,—বানে তুই ভাস্‌লি কেমন ক'রে?"

একটুখানি থামিয়া একটা ঢোঁক গিলিয়া পরী তাহার কালো কালো চোখ দুইটি তুলিয়া বলে, "আমার শ্বশুর-বাড়ী······ওরা আমার কলঙ্ক দিয়ে···মেরে'···বাড়ী থেকে···দূর..."

চোখদুইটি জলে ভরিয়া আসে, ঠোঁটদুইটি কাঁপে,—কথাটা সে আর শেষ করিতে পারে না।

অবিনাশ হাসিয়া বলে, "তাই বুঝি তুই বানে ঝাঁপ দিয়েছিলি?"

পরী নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানায়।

আবার দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকে।

অবিনাশ বলে, "ঘুমো—।"

বলিয়াই সে বাহির হইয়া আসে।

খানিক বাদে অবিনাশ আবার ওঠে।

ও-ঘরের দরজায় গিয়া দেখে, দরজা খোলা।

খাটের উপর পা ঝুলাইয়া হেঁটমুখে পরী তখনও বসিয়া আছে,—আর তাহার পায়ের উপর জানালার পথে এক ঝলক্ জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে।

ঘরে ঢুকিয়াই অবিনাশ বলে, "যাবি পরী, তুই শ্বশুর-বাড়ী যাবি আর?"

ঘন ঘন ঘাড় নাড়িয়া পরী বলে, "না—না—উঁহুঁ!"

খাটের উপর অবিনাশ তাহার পাশে গিয়া বসে।

পরী তাড়াতাড়ি উঠিতে যায়। অবিনাশ তাহার হাতে ধরিয়া বসাইয়া দিয়া বলে,

"বোস্!"

হাসিমুখে পরী একটুখানি সরিয়া বসে।

"ভেবে আমি দেখলাম পরী,—তা হোক্!"—বলিয়া অবিনাশ তাহার সুগোল সুন্দর দুইটি হাতে ধরিয়া পরীকে একেবারে তাহার বুকের উপর টানিয়া আনে।

* * *

সে মুখখানি কোথায় যেন হারাইয়া গেছে! অবিনাশ তাহাকে আর খুঁজিয়া পায় না।

এ-মুখে আর সে-মুখে কোথাও যেন প্রভেদ-পার্থক্য নাই!

রূপে রূপে মিলিয়া মিশিয়া সব যেন একাকার হইয়া যায়······

শেষ

আবির্ভাব

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

তোমারে ডাকিয়াছিনু জীবনের পথে বার-বার;
তাই এলে সমুখে আমার!
সন্ধ্যার ছায়ার মতো ধীরে ধীরে সুমন্দ সঞ্চারে,
এলে তুমি—হেরিলাম জীবনের পথের আঁধারে।

ফুল-ফোটা হ'ল শেষ ; থেমে গেল গান ;
উজল দিবস মোর হ'ল অবসান।
পাখী ডাকিল না আর ; নিবে গেল আলো।
তোমার বিপুল ছায়ে কায়া মোর মিলালো মিলালো।
দু'টি বাহু প্রসারিয়া এলে তুমি অতিথি, ভীষণ—
আমারে লইলে কোলে ; করেছিনু তব আবাহন।

এমনি করিয়া
তোমারে যে ডাকে প্রিয়, পলে পলে মরিয়া মরিয়া,
তীব্র আলিঙ্গনে তব তাহারে কি লও তুমি ঘিরে' ?
তোমার ভীষণ স্নেহে সে যে সখা তিতে আঁখি নীরে!
কি কঠোর পরশ তোমার!
সুধাপাত্র করি' শেষ এলে তুমি সমুখে আমার!

তুমি ছিলে কল্পনার মাঝে,
ছিলে আলস্যের দিনে, ঘুমভরা স্বপনের সাজে ;
আজি হেরি' আকার তোমার,
চিত্তে মোর উঠে হাহাকার!
স্বপন গিয়াছে টুটি' সমুজ্জ্বল এই রৌদ্রালোকে,
তোমার মূরতিখানি ঝলকিছে পলকে পলকে।
আজি তব লেলিহান্ রোষানলশিখা
আমার ললাটে সখা, লিখে দিল দগ্ধ রক্তটীকা।

মহারাজ, আসিয়াছ জীবনের ভস্মসৌধচূড়ে
তোমার কেতনখানি তাই বুঝি উড়ে।
মূঢ়তার হ'ল শেষ ; অন্ধকার গেল বুঝি ঘুচে।
যা' কিছু মিথ্যার লেখা দিলে সব মুছে।
এই ধ্বংসস্তূপশিরে জ্বেলে দিলে একটি প্রদীপ ;
—অসুন্দর ললাটের একখানি টিপ্!

খুলে দিলে সর্ব্ব আভরণ।
রিক্ত, চিরমুক্ত আজি পতিত জীবন।

ভুলে তোমা' ডেকেছিনু জীবনের পথে বার-বার।
ভুল হ'ল মহাসত্য। এলে তুমি সম্মুখে আমার!

পাঁক

শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পথের কি কিছু ধরা-বাঁধা আছে—?

আর তামাসা দেখলে মানুষ একটু দাঁড়ায় বৈকি! কিন্তু তামাসা দেখতে হলে সেই দিকেই যে চোখ দুটো পড়ে থাকবে এমনই বা কি কথা আছে?

তবু খানিকক্ষণের জন্যে মহাদেব তামাসায় অন্যমনস্ক হয়েছিল বটে। হঠাৎ কাঁধে হাত ঠেকায় সে চম্‌কে ফিরে চাইল, এবং পলকে সমস্ত মুখ তার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল।

কিন্তু পরের মুহূর্ত্তেই সে গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার—কি অসুখ করেছে?" নিজের প্রশ্নে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। অবাক হবার কথা নয় কি?

পটলি আবার 'তুমি' হল কবে? ইয়ার্কি ফষ্টিনষ্টি তাদের যথেষ্ট হয়েছে—সে সাবেক 'তুই' কি আর পটলির পক্ষে যথেষ্ট নয়? কখন সে অলক্ষিতে 'তুমি'র আসনে উঠে এল?

পটলি শুকনো একটু হেসে বল্লে, "না, অসুখ হবে কেন!" তারপর এতদিনকার হাল্কা আলাপের রেশটুকু বজায় রাখবার জন্যেই বোধ হয় জোর করে জুড়ে দিলে— "বালাই ষাট্!"

কিন্তু একটু বিলম্বে ও বেসুরো ভাবে।

তার পর দু'জনেই চুপ!—চুপ করে থাকাটা একটু অস্বাভাবিকই বটে! মহাদেবের মুখে দুটো রসিকতার কখন অভাব ত হয় নি! পটলির চোখের চপলতাই বা গেল কোথায়?

দু'জনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরস্পরের সান্নিধ্যে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিল।

কথা না পেয়েই বোধ হয় মহাদেব বল্লে, "আমি যে এখান থেকে চলে যাচ্ছি!"

"কোথায়?"

"সেখানে ডেঙায় বাঘ জলে কুমীর"—বলে মহাদেব একটু হাসবার চেষ্টা করলে।

এইবার আগেকার সুর বজায় রেখে কথা কওয়া সহজ হয়েছে বটে!

পটলি চোখ দুটো বড় বড় করে কৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে

বল্লে, "তবে সেখানে মানুষ থাকে কোথায় গো—তে-শূন্যে?"

তারপর হাসি! কিন্তু পটলির চোখের কোণ কই তেমন যেন কুঁচ্‌কোয় না! তার মুখে চোখে সে দুষ্টুমির আভাও নেই!

নিজেদের অজ্ঞাতে তারা একটু একটু করে তামাসার জায়গা থেকে সরে এসেছে।

মহাদেব বল্লে, "সোঁদর বনে যাচ্ছি যে!"

"বল,—মাইরি-?"

মহাদেব চুপ করে দাঁড়িয়ে হাসছিল!

"যাঃ, আমার সঙ্গে ঠাট্টা—সোঁদর বনে বুঝি আবার মানুষ থাকে! সেখানে ত বাঘ ভালুকের রাজ্যি—"

"না সেখানে মানুষও যায় আবাদ করতে।"

"খেয়ে-দেয়ে কি আর কাজ নেই, সোঁদর বনে যাবে আবাদ করতে!"—মাথার কাপড়টা বুঝি একটু আলগা হয়ে ছিল, পটলি সেটা টেনে দিয়ে বল্লে, "ওসব ভয় দেখানো কথা কও কেন!—এখানে বুঝি তামাসা দেখছিলে?"

"দেখছিলাম ত—দেখতে দিলে কই?"

"আমি কি তামাসা দেখতে বারণ করে দি' নাকি? বাঃ রে—!"

ঠিক আগেকার মতই ঠোঁট উল্টে, ঘাড় দুলিয়ে, কৃত্রিম অভিমান করে, পেছন ফিরে দাঁড়ান চলে এইবার।

কিন্তু পটলি শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মহাদেব বল্লে, "আমি ত তামাসা দেখছিলাম, আমার কাঁধে হাত দিয়ে ডাক্‌লে কে?"

"হ্যাঁ, তুমি তামাসা দেখছিলে! রোজ তুমি এই রাস্তায় তামাসা দেখতে যাও, না?"

এবার দু'জনেই হাসল। পরস্পরের কাছে লুকোচুরি তাদের চলবে না!

পটলি আবার আগের কথা পেড়ে বসল,—"সোঁদর বনে যাবে, ঠাট্টা করছিলে, না?"

কথাটা কি তাকে বিঁধছে—?

না, ঠাট্টা নয়—মহাদেব সত্যি-ই যাবে!

"সে কি খুব বন—সেখানে কি মানুষ গেলে আর পাত্তা মেলে না?"

"তার মানে?"—মহাদেব একটু অবাক হয়ে চাইলে তার দিকে।

"এই ধর, কেউ সেখানে যদি যায়, কেউ কি খোঁজও পাবে না তার?"

কিন্তু এসব কথা কোথায় চলেছে? মহাদেব যেন থই পাচ্ছিল না। অবাক হয়ে সে পটলির দিকে চেয়ে রইল।

পটলি দৃষ্টি নামিয়ে হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়ে বল্লে, "আমি চল্লুম বাপু, অনেকক্ষণ এসেছি, তুমি তামাসা দেখ।"

কিন্তু খানিক দূর গিয়েই ফিরে এসে বল্লে, "ক'দিন রাসের মেলা হচ্ছে, যেতে পারিনি, কালকে নিয়ে যাবে—?"

"যাব—।" যন্ত্রচালিতের মত মহাদেব ঘাড় নাড়লে—।

"তা হ'লে বিলের পোলের তলায় থেক চারটের সময়; বুঝলে?"

পটলি চলে গেল।

… … … …

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মহাদেব কি ভাবে? পটলির সঙ্গে একটু ইয়ার্কি, একটু চোখের ইসারা, দুটো কথা—এই জন্যেই কি এ পথে সে আনাগোনা করে? তার বেশী কি সে কিছুই ভাবে না? শোনা যায়, মহাদেব নাকি বদলে গেছে; সে নাকি লেখাপড়া শিখেছে,—তার মন নাকি ভারী দরাজ—কিন্তু পটলি—? হাবা বিষ্ণুর এই রূপসী বৌটিকে সে কেন ছাড়ে না—এর পেছনে সে কেন ঘোরে—? সে ত আর ছেলে-মানুষটি নয়! কত ধানে কত চাল—তার ত জানা আছে!

আজকের পটলির এই ইঙ্গিত! এত দূর পর্য্যন্তও কি সে ভেবে রেখেছে—? না, পটলির ইঙ্গিতে তাকে চমকে দিয়েছে!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ পাতাল কি ভাবে সে?

কিন্তু বেশীক্ষণ তাকে ভাবতে হ'ল না।

হরি ময়রার সঙ্গে ঠেঙোয় ভর দিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বিষ্ণু এসে বল্লে—"এই যে মহাদেব!" অনেক ভেবে চিন্তে গুছিয়ে ধীরে ধীরে সমস্ত কথা বলবে সঙ্কল্প করেই সে বোধ হয় এসেছিল, কিন্তু সামনে এসে আর সে থাকতে পারল না।

হঠাৎ চীৎকার করে উঠল,—"এ পাড়ায় রোজ রোজ তুই কি করতে আসিস্ পাজী, নচ্ছার শূয়োরের বেটা,—বল্ কি করতে?"

মুখ চোখ তার রাঙা, গলার শিরাগুলো যেন ফুলে ছিঁড়ে পড়তে চায়—। মুখে ফেনা উঠছিল—! শেষের কথাগুলো তার মুখ দিয়ে বেরোলই না।

মহাদেব ভীতু? অতিবড় নিন্দুকও বলতে পারে না। কিন্তু তার মনে হ'ল এই আকস্মিক, হিংস্র, অমানুষিক চীৎকারে তার বুকটা যেন হিম হয়ে গেছে। বিমূঢ় ভীত দৃষ্টিতে সে হাবার দিকে চেয়ে রইল।

এই পঙ্গু কদাকার দেহটি যেন মানুষের নয়। ও যেন কোন্ হিংস্র লোলুপ ভীষণ পশুর!—তার চেয়েও বেশী—ও যেন শয়তানের! এই মুহূর্ত্তে পৈশাচিক হুঙ্কার ছেড়ে ও যেন কণ্ঠনালী তীক্ষ্ণ দন্তে ছিন্ন করে রক্তপান করতে পারে!

অমানুষিক উত্তেজনায় হাবার মুখ তখন সত্যি-ই বীভৎস হয়ে উঠেছে। সে মুখের দিকে চাইতে ভয় করে বটে।

হাবা আবার চেঁচাচ্ছিল—"পাড়া ছেড়ে এসেছি তাতেও নিস্তার নেই, বে-পাড়ায় এসেছ পরের বৌ-ঝির সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে......"

তামাসার লোকও কয়েকজন চীৎকার শুনে এসে জড় হ'চ্ছিল।

"হয়েছে কি? আরে হয়েছে কি?"

এতক্ষণে মহাদেবের প্রথম চমক কেটে গেছে। চওড়া বুকের ওপর হাত দুটো বার করে ভিড়ের সবাইকার মাথা ছাড়িয়ে সে হাবার দিকে নীরবে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখে তার বোধ হয় ঈষৎ অবজ্ঞামিশ্রিত সঙ্কোচ।

ক্রমশ তামাসা ছেড়ে বেশী লোক এসে চারিধারে ঘিরে দাঁড়াচ্ছিল। হাবার বিকট অঙ্গভঙ্গি, উন্মত্ত অক্ষম আস্ফালন একটা দেখবার জিনিষ বই কি!

একটা বামন গোছের গাঁটা গোঁট্টা লোক শুক্‌নো ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মাথাটা দিয়ে গুঁতিয়ে ভিড়ের ভেতরে ঢুকে বল্লে, "কোন শালা এসেছে, বে-পাড়ায় ইয়ার্কি দিতে—কই কোথায় সে শালা?"

হাবার বাক্-শক্তি বুঝি ক্রোধে রুদ্ধই হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ বাঁ দিকে ভর দিয়ে ডান হাতের লাঠিটা তুলে সজোরে সে মহাদেবের মাথায় বসিয়ে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠেঙোর ভর হারিয়ে নিজেও পড়ে গেল।

কিন্তু তখন সেদিকে দেখে কে?

হরি ময়রা পতিত হাবার হয়ে তখন চেঁচাচ্ছে—"এ শালা রোজ আসে বে-পাড়ায় পরের বৌ-ঝির তালাসে—মার্ শালাকে।"

বাণ-মারামারি নতুন তামাসার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে বন্ধ হয়ে গেছে। একটা ইটের ঢেলা সজোরে এসে মহাদেবের গালে লেগে গালটা কেটে গেল।

ভিড়ের মাঝে কথাটা নানা আকারে তৎক্ষণে প্রচার হয়ে গেছে।

"বৌ নিয়ে পালাচ্ছিল?—কার?"

"কার তা কে জানে—এই যে শালা! মার্—শালাকে।"

"ঘরে ঢুকেছিল বুঝি মেয়েছেলের পেছনে?"

"ধরতে গিয়েছিল।"

এমন মজা কালে-ভদ্রে হয়। কিল চড় ঘুষি লাথি লাঠির বাড়ি যে যা দিয়ে পারে!—ভিড় তখন মহাদেবের চারিধারে ঝড়ের মত তুমুল হয়ে উঠেছে।

আর মহাদেব? বুকখানা কি তার মিছিমিছিই চওড়া—! কিন্তু একা! জামা-কাপড় চুল ছিঁড়ে সর্ব্বাঙ্গ কেটে তার রক্ত পড়ছিল। একটা লোক পেছন থেকে ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে তাকে মুখ থুবড়ে মাটিতে ফেলে দিলে।

তারপর উন্মত্ত মানুষের স্রোত এসে পড়ল! কিল চড় লাথি......

ছুটো ছোট ছোট ছেলে দূরে দাঁড়িয়ে বলাবলি করছিল, —"এই দেখ্, বেটার চুল ছিঁড়ে এনেছি..."

ক্লান্ত হয়েই বোধ হয় শেষটা ভিড়ের উত্তেজনা শান্ত হ'ল। রক্তমাখা ছিন্ন বেশে প্রায় অর্দ্ধমৃত অবস্থায় মহাদেবকে তারা সে-পথ থেকে বার করে দিলে।

কিন্তু একি!

হাবা এখনো মাটিতে পড়ে কাৎরায় কেন?

হরি ময়রা এসে বল্লে, "দেখলে ত মারটা!"

হাবা কিন্তু বাঁ হাতে ভর দিয়ে একটু উঠে হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে ফেল্লে।

"আরে, হয়েছে কি?"

"আমার ডান হাতটা।"

"কি হ'ল আবার ডান হাতে?"—হরি ময়রা ডান হাতটা তুলে ধরল, "কই, কি হয়েছে?" কিন্তু ছেড়ে দিতেই হাতটা দড়ির মত অসাড় ভাবে নেতিয়ে পড়ল।

ডান হাতটাও গেল বটে! .....

... ...

ঘরের মধ্যে বোধ হয় অক্ষম আক্রোশে পটলি তখন চুল ছিঁড়ছিল।

—ক্রমশ

চয়নিকা

গান

শ্রী অতুলপ্রসাদ সেন

ওগো সাথী, মম সাথী, আমি সেই পথে যাব সাথে
যে-পথে আসিবে তরুণ প্রভাত, অরুণ-তিলক মাথে,
যে-পথে কাননে আসে ফুলদল
যে-পথে কমলে পশে পরিমল
যে-পথে মলয় আনে সৌরভ, শিশির-সিক্ত প্রাতে।
যে-পথে বধূয়া যমুনার কূলে
যায় ফুলহাতে প্রেমের দেউলে,
যে-পথে বন্ধু, বন্ধুর দেশে, চলে বন্ধুর সাথে—
যে-পথে পাখীরা যায় গো কুলায়
যে-পথে তপন যায় সন্ধ্যায়—
সে-পথে মোদের হ'বে অভিসার, শেষ তিমির-রাতে॥

—উত্তরা, পৌষ, ১৩৩৩।

লিওনিদ্ আন্দ্রিভ্

শ্রী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

১৮৭১ খৃঃ অঃ রুষদেশে Orel নগরে লিওনিদ্ আন্দ্রিভ জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তিনি যাকে বলে রীতিমত দুষ্টু ছেলে, তাই ছিলেন। পরের বাগানে আপেল চুরি করা থেকে, পাড়ার ছেলের মাথা ফাটান পর্য্যন্ত সমস্ত গুণ ছেলেটির মধ্যে ছিল। শীতকালে নদীতে বরফ জমে থাকত—তার উপর রাতদিন স্কেটিং চলেছে; অনেক বার পায়ের তলায় বরফ গলে টান ধরেছে, ছেলের হুঁস্-ই নেই। এই সমস্ত দুষ্টুমীর মধ্যে মাঝে মাঝে ছেলেটি দল ছেড়ে একলা চুপ করে বসে থাকতো। আন্দ্রিভের মা'র মতে ছয় বছর বয়স থেকেই আন্দ্রিভের থিয়েটারের দিকে ভয়ানক ঝোঁক পড়ে। মাঝে মাঝে পাড়ার ছেলেদের নিয়ে কারুর বাগানে—মস্কো আর্ট থিয়েটারের ভবিষ্যৎ নাট্যকার—খেলা ঘরের ষ্টেজ তৈরী করে অভিনয় করতো। আন্দ্রিভের আত্মকাহিনী থেকে জানা যায় যে, সাত বছর

বয়সেই ছেলেটি সেখানকার লাইব্রেরীর একজন সভ্য হয়ে রীতিমত বই পড়া আরম্ভ করে দিয়েছে।·········

···শৈশব থেকেই আন্‌দ্রিভের মনে প্রাচীরহীন দিগন্তরের ডাক এসে পড়ে। কিন্তু জীবন যত অগ্রসর হয় প্রাচীরের পর প্রাচীর তত মাথা তুলে উঠে। জীবনের চারিদিকে প্রাচীরের প্রকাণ্ড ব্যবধান। এই প্রাচীরের প্রতীক তাঁর মনে এত পেয়ে বসে যে, তাঁর ভবিষ্যৎ লেখায় বহুস্থলে এর আবির্ভাব হয়। "Anathema"-য় দেখি, মানুষের প্রবুদ্ধ চেতনার প্রতীক রহস্যলোকের নির্ম্মম শিলা-গাত্রে বারেবারে প্রহত হয়ে ফিরে আসছে। এবং পরে এই ব্যবধানের কাহিনী নিয়েই তিনি "The Walls" লেখেন।

আন্‌দ্রিভের ভবিষ্যৎ জীবনে দেখা যায় যে, বারে বারে কোলাহলময় নগর ছেড়ে ভীত ও আহত শশকের মত তিনি জনহীন প্রকৃতির গহন বুকে মমতাময় আশ্রয়ের খোঁজে ছুটেছেন। পরে রুষিয়া ছেড়ে সত্যসত্যই তিনি জনহীন Finland-এ এক পরিত্যক্ত "Castle"-এ জীবন অতিবাহিত করেন।

শৈশবে স্কুলের ধরা-বাঁধার মধ্যে বালকের মন তিক্ত হয়ে উঠত। ক্লাসের পড়াশোনা একদম হত না। তাঁর আত্মকাহিনী থেকে জানা যায় যে, তার ফলে প্রায়ই স্কুলের বারান্দার এক অন্ধকার নির্জ্জন কোণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে দাঁড়িয়ে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হত। এই ঘটনার উল্লেখে তিনি বলছেন,—

"সেই জনহীন সুদীর্ঘ বারান্দায় মথিত-শব্দময় এক অপূর্ব্ব নিঃশব্দতা বিরাজ করত। মাঝে মাঝে দূরে পায়ের শব্দ হত। বারান্দার দু'ধারে দরজা বন্ধ করে ক্লাস হচ্ছে। ক্লাস-ভরা ছেলে। উপরের ভাঙ্গা দেয়ালের এক ফাঁক দিয়ে একটি পথ-ভোলা সূর্য্যের কিরণ পায়ের কাছে ধূলোর উপর এসে পড়ত। আমার কাছে এই সমস্ত কেমন অপূর্ব্ব রহস্যময় লাগত, শাস্তি আমার সুন্দর হয়ে উঠত; ভাঙ্গা ফাটলের দিকে চেয়ে মনের মধ্যে কি ব্যাকুলতা স্তব্ধ হয়ে থাকত···"

বালক আন্‌দ্রিভ্ যখন শৈশব-কল্পনায় উদাসীন, তখন এমন একটি ঘটনা ঘটে যার ফলে জীবনের নির্ম্মম বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর জীবন একেবারে একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেল। আন্‌দ্রিভের পিতা সহসা সমস্ত পরিবারকে একেবারে পথের ভিখারী করে চলে গেলেন।

কোনও রকমে আন্‌দ্রিভ্ স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে আইন অধ্যয়নের জন্যে পেট্রোগার্ড-এ আসেন। এই সময় তাকে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। অনশন অভ্যাসের মত হয়ে উঠল। অথচ অভিমানী যুবা দাক্ষিণ্যের দ্বারেও হাত পাততে পারে না। আন্‌দ্রিভের আত্মজীবনীতে এই সময়ের ঘটনার উল্লেখে আছে, "সেই সময় আমি প্রথম গল্প লিখি। একটি ক্ষুধার্ত্ত ছাত্রের কাহিনী নিয়ে আমি আমার প্রথম গল্প রচনা করি। যতক্ষণ আমি গল্পটি লিখেছি, ততক্ষণ অবিশ্রান্ত কেঁদেছি। একদিন সন্ধ্যাবেলা গল্পটি হাতে নিয়ে এক খবরের কাগজের সম্পাদকের নিকট উপস্থিত হই। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কয়েক মিনিট পরে সম্পাদক হেসে গল্পটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর ক্ষুধার তাড়নায় কতবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি—মাসিক-পত্রিকার অফিসের চৌকাঠ থেকেই ফিরে এসেছি।"

এই সময় আন্‌দ্রিভ্ প্রথমবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে কৃতকার্য্য হন নি, বরং তার ফলে যাবজ্জীবন হৃদ্-রোগে কষ্ট পান। জীবনে তিনি তিনবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। আন্‌দ্রিভের আত্মজীবনীতে এই সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে, "টলষ্টয়ের 'What is my Faith' পড়ে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। তন্ন তন্ন করে তার প্রতিটি অক্ষর বারবার পড়লাম। কিন্তু টলষ্টয়ের মতের সঙ্গে মিলতে পারলাম না। রুষিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষের বাণীর একটি দিক মর্ম্মস্পর্শ করল—আর একটি দিকের সঙ্গে কিছুতেই মনের মিল ঘটাতে পারলাম না। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস—জীবনকে ঈশ্বরের মঙ্গল অস্তিত্বের অনুযায়ী পরিপূর্ণ করে তোলা—বুঝলাম না। বুঝলাম—তাঁর মর্ম্মছেঁড়া বেদনার চীৎকার। এই অভিশপ্ত

জীবনের কি প্রয়োজন? তারপর একদিন এক মে মাসের রাত্রিতে বহু লোক মিলে উন্মাদ উৎসবে মত্ত ছিলাম। ফিরবার পথে রেল-লাইন পড়ে। উৎসবান্তে তারা সব এগিয়ে চলেছে—গানে, আর আনন্দ-কাকলীতে সে নিঃশব্দ প্রদেশ মুখর হয়ে উঠেছে। সবার পিছনে থেকে আমি ভাবি—এই সঙ্গীত—এই কাকলী—জীবনের শূন্যতাকে লুকিয়ে রাখবার এ কি ব্যর্থ প্রয়াস!...হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, ট্রেণ আসবার তো সময় হয়েছে...লাইনের উপর শুয়ে রইলাম...যদি বাঁচি তা হ'লে নিশ্চয়ই বাঁচবার কোনও মানে আছে; মরি, ভবিতব্যতা ...সংজ্ঞা যখন হল তখন হাঁসপাতালে, মাথা আর বুকের যন্ত্রণায় সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠল...আমার বয়স তখন ষোল..."

আন্‌দ্রিভের প্রথম গল্প Bargomot and Garaska প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর সাঁইত্রিশ বছর বয়সে। এর আগে তিনি আদালতের রিপোর্টারের কাজ করতেন। তখন গর্কীর প্রতিভা পরিপূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়ে উঠেছে; গর্কীর নাম তখন দেশে দেশান্তরে (১৯০৮) ছড়িয়ে পড়েছে। গর্কীর সম্পাদিত কাগজে আন্‌দ্রিভের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। এই গল্পটির মধ্য দিয়ে রুষ-সাহিত্যের এক-যুগের সর্ব্বশেষ দুই সাহিত্য-রথীর অপূর্ব্ব বন্ধুত্ব ঘটে। এবং এই বন্ধুত্বের জন্য আন্‌দ্রিভ্ সারাজীবন গর্কীর নিকট অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গেছেন, কারণ গর্কীই আন্‌দ্রিভের সুপ্ত প্রতিভাকে মাতৃ-স্নেহে বিকশিত করে তোলেন। যদিও পরে বোলশেভিজিমের উত্থানের ফলে এই দুই জনের মধ্যে ভীষণ মতদ্বৈধতা জন্মায় এবং দুই বিভিন্ন দল থেকে এই দুই প্রতিনিধি মসী যুদ্ধে রত হন—তবুও এই বন্ধুত্বের ব্যক্তিগত দিক অক্ষুন্নই ছিল।

১৯০১ সালে আন্‌দ্রিভ্ প্রথমে তাঁর ছোট গল্পগুলি একত্রিত করে একখানি বই প্রকাশ করেন। এবং এই গল্পগুচ্ছই একদিনে তাঁকে সমস্ত রুষিয়ায় সকলের সঙ্গে পরিচিত করে দিল। আন্‌দ্রিভের প্রতিভা বিকশিত হয় তাঁর যৌবনের শেষে; কিন্তু বিকশিত হয়েই সে তার অতুল সৌরভে সমস্ত দেশকে মগ্ন করে। টলষ্টয়, টুর্গেনিভ, গর্কীর সঙ্গে আন্‌দ্রিভের নাম উচ্চারিত হল। এমন কি 'Tsar Hunger'-এর আঠারো হাজার বই-এর একটি সংস্করণ একদিনেই বিক্রী হয়ে গেল।

মস্কো শহরে তখন 'Wednesdays' বলে এক সাহিত্য-সভা ছিল। প্রতি বুধবার তার অধিবেশন হত। এই সভায় গর্কী, শেখভ, বুনিন, কবি বাল্‌মণ্ট প্রভৃতি রুষিয়ার তদানীন্তন অনেক সাহিত্যিক যোগদান করতেন। এখানে প্রত্যেক বুধবার কেউ না কেউ তাঁর রচনা পাঠ করতেন এবং তারপর সেই রচনা সম্বন্ধে সভার মধ্যেই স্পষ্ট আলোচনা চলত। এই সভায় আঁন্‌দ্রিভ্‌ও যোগদান করেন। এবং তাঁর বহু গল্প প্রথম এই সভাতেই পঠিত হয়।

আন্‌দ্রিভের জীবনের ট্র্যাজেডি এইখান থেকেই সুরু হয়। ১৯০৫ সালের ২২শে জানুয়ারী রুষিয়ার বাইরের রূপ বদলাতে থাকে। জারের সিংহাসন টলে উঠে। উন্মাদ ক্ষুধার্ত্ত জনসাধারণ ক্ষমতার সম্ভাবনায় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে। জনতার এই ভয়ানক উন্মাদ মূর্ত্তি আন্‌দ্রিভের মনে সন্দেহের রেখাপাত আনে। "বুধবার"-এর সমস্ত সভ্যই মার্কস্-পন্থী এবং জনতার পক্ষপাতী। হয়, আন্‌দ্রিভ্‌কে নিজের মনের সন্দেহ ও বিদ্রোহকে চেপে, সকলের সঙ্গে যোগ দিতে হয়—না হয় জীবনের সমস্ত মায়া পরিত্যাগ করে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করতে হয়। যে বিশ্বাস ও সরলতার বলে গর্কী সন্দেহকে এড়িয়ে অসীম কর্ম্মের মধ্যে আত্মনিয়োগ করলেন—জীবনের প্রতি সে বিশ্বাস ও জনতার প্রতি সে শ্রদ্ধা আন্‌দ্রিভের ছিল না। Neitzche-র Superman-এর মত আন্‌দ্রিভের মনে জনতার প্রতি একটা বিরূপ ভাব ছিল। দেশের চারিদিকে তখন ভয় আর ভাবনা, জীবনের চারিদিকে যেন এক নিগূঢ় রহস্যের ঘন-যবনিকা এসে পড়েছে। সত্যি, মিথ্যা, সুনীতি, দুর্নীতির ভেদ-রেখা লুপ্ত হয়ে আসছে। অসীম দ্বন্দ্বে দেশের অন্তর আলোড়িত হয়ে উঠল। লৌকিক

দিক থেকে আন্‌দ্রিভের সাহিত্য তখনকার রুষ-মনের ভিতর ও বাহিরের এই দ্বন্দ্বের ছবি। কিন্তু রুষ-সাহিত্যিক কাল ও দেশকে স্বীকার করে অপূর্ব্ব কলাকৌশলে কাল ও দেশ উভয়কেই অতিক্রম করে এক লোকোত্তর রূপ পরিগ্রহণ করেন।

আন্‌দ্রিভ্ জীবনের চারিদিক থেকে ব্যাহত হয়ে ক্রমশ আপনার মনের মধ্যে ফিরে আসেন। বোলশেভিক রুষিয়া থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে দূর ফিন্‌ল্যাণ্ডে আন্‌দ্রিভ্ বসবাস করেন। আন্‌দ্রিভের শেষজীবন জনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচার করতেই রত থাকে। একদিক থেকে গর্কী pamphlet লিখছেন, অন্যদিক থেকে আন্‌দ্রিভ্ তার উত্তর দিচ্ছেন। এ থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে, আন্‌দ্রিভ্ রুষিয়াকে ভালবাসতেন না। তার চেয়ে মিথ্যা কিছু আর হতে পারে না। প্রত্যেক রুষ-সাহিত্যিক রুষিয়াকে আপনার রক্ত দিয়ে বন্দনা করে গেছেন। কিন্তু সে বন্দনার ছন্দ বিভিন্ন—এই যা।

আন্‌দ্রিভের মন এত কোমল ও সংসার-অনভিজ্ঞ ছিল যে, কোনও দিন সে কোনও একটি ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারে নি। জীবনের শেষ দিকে তিনি রুষিয়ার সাহায্যের জন্য আমেরিকায় যাবার সঙ্কল্প করেন। সেই প্রসঙ্গে বিখ্যাত শিল্পী Nicholas Roerich-কে এক পত্রে লেখেন যে, "Ah, only now I see to what extent I am childlessly helpless in life. Yet to-day is my birthday : Forty-eight years I have been walking on the earth, and have so little adapted myself to its ways."

এই চিঠি লেখার কয়েক দিন পরে আন্‌দ্রিভ্ তাঁর শেষ চিঠি লেখেন। "আজ আমার একান্ত দুঃখ যে—আজ আমি গৃহহীন...ফিন্‌ল্যাণ্ডে আমার ছোট্ট ঘরখানি ছেড়ে চলে এসেছি...তার পরে আমার আরও বিশাল এক গৃহ ছিল—সে আমার রুষিয়া......তার চেয়েও উদার, বিরাট এক ঘর ছিল—সে আমার সৃষ্টি, আমার কাব্য! আজ আমি গীতহীন...গৃহহারা..."

দু'দিন পরে আট-চল্লিশ বছর বয়সে (১৯১৯) আন্‌দ্রিভ্ মারা যান। জীবনের অধিকাংশই নির্ব্বাসনে কাটে; তেলের অভাবে রাত্রে বাতি জ্বলে নি ঘরে; এমন কি রুষিয়ার অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক—তাঁর মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পয়সাও রেখে যেতে পারেন নি।

আন্‌দ্রিভের সাহিত্য বিংশ-শতাব্দীর নিশীথ-স্বপ্ন। গৌরবের ও কর্ম্মশক্তির শীর্ষ-স্থানে এসে, এ যেন আবার প্রত্যাবর্ত্তন। যন্ত্রের অধিরাজ দেখে সে যাকে দেবতা বলে অর্ঘ্য দিয়ে এসেছে—সে মিথ্যা; সে শুধু অর্ঘ্যই নিয়েছে। মনের গুহায় হিরণ্ময়পাত্রে সত্যের সুধা এখনও যে অনাস্বাদিত রইল! আকাশের যবনিকা তেমনই সুনীল রহস্যে আবৃত রইল! তেমনি মানুষের মন সীমার প্রাচীরে বন্দী হয়ে রইল!

"জীবনের চারিদিকে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর। প্রাচীরের ও-পারে সব-জানার দেশ। প্রাচীরের এ-ধারে অসম্পূর্ণ জীবনের ভার নিয়ে মানুষ চলেছে হঠাৎ জন্ম থেকে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু পর্য্যন্ত। এ-পারের মানুষ শুনেছে প্রাচীরের ও-পারে আছে—জীবনের সমস্ত সম্পূর্ণতা। মাঝে অমোঘ শত্রুর মত প্রাচীর দাঁড়িয়ে। কত লোক ব্যর্থ চেষ্টা করল তার উপরে উঠতে। একজন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোক এই সমস্ত হতাশ লোকদের দেখে বিদ্রূপ করে বলে, হায় রে, মূর্খের দল···তারা ভাবে পাঁচিলের ও-পারে বুঝি আলো আছে······সেখানেও এম্‌নি অন্ধকার······ এম্‌নি অন্ধকারে সেখানেও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত রোগী মরণ ভিক্ষা করে পথে পথে চলেছে···

"তবুও চেষ্টার অন্ত নেই। একবার অগণিত জন-সমুদ্র এসে সেই প্রাচীরের পাষাণগাত্রে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করল, প্রাচীর তেম্‌নি নিশ্চল রইল। শ্রান্ত-শক্তি মানুষের দল শক্তিহীন মুমূর্ষু হয়ে আহত জন্তুর মত পাঁচিলের তলায় পড়ে রইল...তারা মৃত্যুর আগমনী শুনছে···আমি ...কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুক সেখানে চুপ করে বসে ছিলাম ···দেখি, পাঁচিল বুঝি কেঁপে উঠছে...মনে হল তার

প্রতি শিলায় শিলায় যেন পতনের ভয় কেঁপে কেঁপে উঠছে, ...আমি চীৎকার করে উঠলাম,...বন্ধু, জাগো...প্রাচীরের বুকে ভাঙন ধরেছে...

"মুমূর্ষুরা শ্রান্তকণ্ঠে উত্তর দিল, ভুল দেখেছ ভাই...

"তখন কে যেন আমার মধ্যে থেকে উত্তর দিল, যদিই এ প্রাচীর এখনও অচল থাকে—তাতে কি? প্রত্যেক মৃতদেহ দিয়ে আমরা সোপান রচনা করব...সংখ্যায় ত আমরা অনন্ত...একটার পর একটা...হয় ত সেই সোপান বেয়ে একজনও প্রাচীরের উপরে উঠতে পারবে...একজন মানুষের কাছেও রহস্যের, স্বর্গলোকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হবে..."

—কল্লোল, মাঘ, ১৩৩৩।

অসংলগ্ন

দেশের নেতা, উন্মাদের অস্ত্রাঘাতে শহীদের স্বর্গে গেছেন।

এই ভয়ঙ্কর হত্যার সংবাদে সারা ভারতবর্ষের গায়ে কাঁটা দিয়েছে।

কিন্তু খবরের কাগজে মারাত্মক ছাপার ভুল দেখে বিস্মিত হলাম। পড়লাম—মুসলমান হত্যাকারীর দ্বারা হিন্দু নেতা নিহত।

তারপর মনে হল এ ছাপার ভুল নয়—এ ভুল সম্পাদকের। শেষে বুঝলাম—এ ভ্রম সর্ব্বসাধারণের এবং এই ভুলই সমস্ত সর্ব্বনাশের মূল!

অকারণ বিশেষণের বিষে আমরা জাতিকে বিপন্ন করে তুলছি।

ছোট ব্যাপারে যে বিশেষণ হাস্যকর, বৃহৎ ঘটনায় সে বিশেষণ মারাত্মক। কিন্তু আমরা ছোটকে তুচ্ছ করে গুরুত্বের খাতিরে বড় ভুল করতে দ্বিধা করছি না।

পুলিশ কোর্টের সংবাদে আমরা কখনও লিখি না কর্ত্তাভজা বৈষ্ণব ভিখারীর দ্বারা হনুমান-ভক্ত দরোয়ানের ঘটি চুরি। ঘটি চুরি সামান্য ব্যাপার এবং কর্ত্তাভজা বৈষ্ণব ও হনুমান-ভক্ত দরোয়ানের সংখ্যা নগণ্য বলেই বোধ হয় লিখি না। অথবা সত্যই আমাদের এ জ্ঞানটুকু হয় ত থাকে যে, ঘটি চুরির কাহিনীতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও হনুমান-ভক্তির কোন সংস্রব নেই। কিন্তু আমরা ফরমাসী বড় হরপে সংবাদ-পত্রের সমস্ত ললাট জুড়ে লিখি—মুসলমান গুণ্ডার ছুরিতে হিন্দু কুলির মৃত্যু। কারণ মৃত্যু বড় ব্যাপার এবং হিন্দু মুসলমান এই দুই ধর্ম্মভুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা দেশে বেশী। ব্যাপারের গুরুত্ব আমাদের সহজ বুদ্ধিকে অভিভূত করে রাখে।

সংবাদ-পত্রের ললাট-লিপি যে বিধিলিপি হয়ে ওঠে আমাদের সে হুঁস নেই। আমরা বাক্যের বারুদ নিয়ে মূঢ়ের মত খেলা করি মানুষের মর্ম্ম না জেনে।

*

* *

কথা নিয়ে যাদের কারবার কথার শক্তি সম্বন্ধে তারাই সব চেয়ে অজ্ঞ—এই বিশৃঙ্খল যুগের এইটিই একটি বিশেষত্ব। বেপরোয়া ভাবে বিশেষণ ব্যবহার করতে আজ কোথাও বাধে না।

যে গুণ্ডা মানুষ খুন করে—সেও সংবাদ-পত্রের দৌলতে ধর্ম্মের শিরোপা পেয়ে হিন্দু বা মুসলমান হয়ে ধন্য হয়। যে খুনে, সে যে শুধু খুনে—সে মুসলমানও হতে পারে না হিন্দুও হতে পারে না—এই কথা ভাববার অবসর আমাদের

নেই। আমরা বিশেষণ প্রয়োগ করি। এবং সেই হেলায় ছড়ানো বিশেষণকে কেন্দ্র করে, মানুষের অন্তরের যে পশু এখনও মরে নি, আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় হিংস্র নখর শানিয়ে সে শক্তি সঞ্চয় করে।

মানুষের অন্তরের হিংস্র পশু এখনও মরে নি এ কথা সত্য—কিন্তু আমাদের নির্ব্বোধ ভাবে নিক্ষিপ্ত বাক্যের আশ্রয়ে সে আপনাকে সংগ্রহ করবার ছুতা পায় না কি? দাঙ্গাকারীর দাঙ্গাকে নামের বিশেষণ দিয়ে আমরা বিস্তৃত হ'বার পথ করে দিই। গুণ্ডাকে হিন্দু বা মুসলমান বলে আমরা হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায় ভুক্ত যে কোন ব্যক্তির সুপ্ত গুণ্ডামির প্রবৃত্তিকে জাগ্রত হ'বার সুযোগ দিই।

*

* *

হিন্দু-মুসলমানে মিলনের আন্দোলন যেদিন থেকে প্রবল ভাবে সুরু হয়েছে ঠিক সেই দিন থেকেই হিন্দু-মুসলমানের নামে বিরোধও প্রচণ্ড ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

যেখানে গরমিল সেখানে গোঁজামিল দিতে চেয়ে আমরা পার্থক্যকে সচেতন করে তুলেছি।

হিন্দু-মুসলমানে মিলন হতে পারে না এই কথাটা আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে। তা হ'লেই মানুষে মানুষে মিলন হতে পারে এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথাটা আমরা ভাল করে বুঝব।

হিন্দু-মুসলমানে মিলন হতে পারে না—দাঙ্গাও হতে পারে না—তর্ক হতে পারে বটে মৌলভী ও পণ্ডিতে। কিন্তু এই পরম উপভোগ্য, উপাদেয় আয়োজন আমরা কখন করেছি বলে মনে পড়ে না। ধর্ম্মভাবের উন্মাদনায় এ দু'টি যে ধর্ম্ম এ কথা আমরা ভুলতেই বসেছি।

বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য হয় ত আছে, কিন্তু সে পার্থক্যের মীমাংসা কি লাঠির সাহায্যে হয়?

ধর্ম্মের বিরোধের সমাধান ভবিষ্যৎ একদিন করবেই, কিন্তু তার আগে ধর্ম্মকে লাঠির নাগাল থেকে সরিয়ে মানুষের মিলনের দুরূহ সাধনা আমরা সুরু করতে পারি নাকি?

কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা যেন আমরা মুখে না আনি।

...দু'টি মহৎনামের মুখোস হারিয়ে পশুত্ব তার বীভৎস মুখ কোথায় লুকায় দেখা যাক্।

*

* *

হিন্দু-মুসলমানে মিলন হতে পারে না, এত বড় দুঃসাহসিক কথার একটু ব্যাখ্যা দরকার।

হিন্দু-মুসলমানে সত্যিকারের কোন বিরোধ নেই বলেই মিথ্যেকারের মিলন হতে পারে না। কোন সত্য-ধর্ম্মের সঙ্গেই কোন সত্য-ধর্ম্মের বিরোধ থাকা অসম্ভব। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমাদের স্বীকার করতেই হবে, দুনিয়ার কোন সত্য-ধর্ম্মই মিথ্যার জঞ্জাল থেকে একেবারে মুক্ত নয়। মানুষের মনের দিব্য প্রেরণা শতাব্দী থেকে শতাব্দীর পথে ধূলা, বালি, জঞ্জাল জড়িয়ে নিয়ে আসে।

বিরোধ সেই মিথ্যার সঙ্গে মিথ্যার। বিরোধ মসজিদের পথে বাজনা আর বাজনার পথে মসজিদ নিয়ে .....

মিথ্যার মৃত্যু হোক্—হওয়া প্রয়োজন,—মিলন নয়।

ধর্ম্ম যেখানে মিথ্যার জঞ্জাল থেকে মুক্ত সেখানে মিলনের কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

*

* *

'অসংলগ্ন' পড়ে চিন্তার বিশৃঙ্খলায় শুনলাম অনেকে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। 'অসংলগ্নে' সংলগ্নতা না পেয়ে এ-রকম ক্ষুণ্ণ হওয়া অন্যায় বটে, তবে আশ্চর্য্যের কথা নয়। এই রকম দুঃখই আমরা করে থাকি।—রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিতে নেমে নেতা হন নি বলে আমরা ক্ষুণ্ণ হই, উপন্যাস উপনিষদ্ হয় না বলে আমরা উষ্ণ হই, 'সন্দীপ' 'নিখিলেশ' না হবার জন্যে আমরা রাগি, 'কিরণময়ী'কে 'কিরণময়ী' করার জন্যে গাল দিই এবং ছেলেমানুষকে ছেলেমানুষী করার জন্য শাসন করি।

অর্থাৎ আমরা দুনিয়ার দুনিয়া হওয়া বরদাস্ত করতে পারি না।

কারণ আমরা বড়াই করে বলি আমরা সাদা-সিধে লোক। অর্থাৎ আমরা সংসারের সাতটা রঙকে অস্বীকার করে সব সাদা দেখি বা দেখতে চাই। সংসারে এই সাদার জয়জয়কার—সাদা বুদ্ধির, সাদা সাধুতার, সাদা সরলতার। আমাদের গর্ব্ব—মাথা আমাদের ঠিক আছে—

যদি কেউ জীবনের নেশায় চুর হয়ে বলে, সৃষ্টিটা রঙীন, আমরা তাকে গাল দিই—মাতাল!

নেশা করলে মাতাল বলবে না ত বলবে কি?

*

*

ছন্দের কথা ভাবছিলাম।

ভারতচন্দ্রের কাছে সাবেক ঢঙে নেচে যে বাঙলার আর মজুরা জোটেনি তারি কন্যাকে ঈশ্বরগুপ্ত হাঁটতে শিখিয়েছিলেন। এবং হেমচন্দ্র, মাইকেল, নবীনের কাছে তার পায়ের আড় ভেঙেছিল।

কিন্তু তাকে নাচের পা দিলেন রবীন্দ্রনাথ। এবং তাঁরি সঙ্গে বৈচিত্র্য আনলেন সত্যেন্দ্র। তারপর—?

ভাবছিলাম তারপর ছন্দের ভবিষ্যতের কথা। এ নটীর চঞ্চল চরণে নতুন সুর দেবে কে?

মোহিতলাল, নজরুলের নজর নটীর চরণের চেয়ে কণ্ঠের দিকেই বেশী। তারপরের নবীন কবির দল ত ছন্দের দু'কূল ভেঙে প্লাবনের মত পথে বেরিয়েছেন। তাঁদের কবিতা পড়ার আগে দু'দণ্ড চেয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। মনে হয় যেন পদ্মার ছবি—কূল থেকে কূলে অতর্কিত ভাঙনের ধারায় চলেছে।

শুধু এদেশে কেন, সব দেশেই দেখি কবিতার যেখানে নাভিশ্বাস নয় সেখানেই তার এই উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাস। ছন্দকে সে ছাপিয়ে চলেছে।

কাব্য-জগতে মার্কিন মুলুককে আজকাল উপেক্ষা করা যায় না। সব জিনিষের মত কাব্যেও সেখানে যথেষ্ট ধাপ্পা-বাজি আছে বটে, তবে সত্যিকারের গুণীও গণনায় মেলে। এবং সেখানেও এই একই কাহিনী। স্বাধীনতার স্বর্গ হয় ত নয়, 'ফ্রী ভার্সের' মুলুক সেটা নিঃসন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—তীর যেমন নদীকে বাঁধে না বরং বেগ দেয়, ছন্দ তেম্নি কবিতাকে বন্ধনের ছলে গতিতে মুক্তি দেয়। তিনি আরো বলেছেন—ছন্দের দোলায় দুলিয়ে কবি সামান্য কথাকে অসীম ইঙ্গিত দেন।

সত্য কথা।

কিন্তু তাঁর 'বলাকা' বাংলা কাব্যের আকাশে অশান্ত পাখায় বন্ধনহীন উল্লাস নিয়ে এসেছে। তাঁর 'পলাতকা' ছন্দের মাত্রা ডিঙিয়ে পালিয়েছে। এবং বাংলা সার্থক হয়েছে।

তাই ভাবি, মানুষের কবি-মানস কি নদী ছিল—আজ সে কি সাগরে গিয়ে পড়েছে? যা ছিল তরু তা কি আজ অরণ্য হয়েছে?

নবযুগের বাণী কি আর পুরাতন ছন্দে ধরছে না?

নবযুগের অন্তরে যে বিপুল উদ্বেলিত ব্যাকুলতা সে কি আজ পুরাতন ছন্দের কূল ছাপিয়ে যোগ্যতর মহত্তর বিশালতর ছন্দের সন্ধানে মেতেছে?

* *

*

নারীর কথা তুললে পুরুষের কথা বেশী শুনতে হয়। এবং সেটা স্বাভাবিক। কারণ পুরুষের পৌরুষ এখনও আছে।

পুরুষের পৌরুষ এখনও আছে, কারণ নারীর নাগপাশ এখনও মোচন হয় নি।

পুরুষ আপন পৌরুষে নারীর নাগপাশ একদিন ছেদন করবেই। এবং সেদিন মানুষের মনুষ্যত্ব থাকবে, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রধর্ম্ম ও শূদ্রের দাসত্বের মত পুরুষের পৌরুষ গল্প-কথা হবে মাত্র।

মন্দকে ওপড়াবার সঙ্গে একটা ভালর বিনাশ হয়। না ঘুরিয়ে বল্লে দাঁড়ায়—প্রত্যেক অন্যায় ও অশুভকে আশ্রয় করে মানুষের চরিত্রের এক একটি মহত্ত্ব বেড়ে উঠেছে।—মানুষের দুঃখকে অবলম্বন করে করুণা আছে, কাপুরুষের দুর্ব্বলতা বীরের আত্মত্যাগস্পৃহা জাগ্রত করে, পৃথিবী বিপদ-সঙ্কুল তাই মানুষ সাহসী···

কোন রকমে পৃথিবীর সমস্ত বেদনা যদি দূর করে ফেলা যায়, সকল প্রকার দুর্ব্বলকে কোন প্রকার মানসিক অস্ত্রোপচার করে যদি বীর করে তোলা যায়, ও পৃথিবীকে ইডেন গার্ডেনের মত নিরাপদ করে দেওয়া যায়, তা হ'লে দয়া ন্যাকামি, ও আত্মত্যাগস্পৃহা পাগলামি হয়ে দাঁড়াবে এবং সাহসী হাস্যাস্পদ হবে মাত্র।

যদি কেউ আজ সুস্থ সবল মাংসল ছ' ফুট্ কয় ইঞ্চি কাবুলের আমীরের দুঃখে ভাবনায় কাতর হয়ে পড়ে, ক্যাল্ক্যাটা ফায়ার ব্রিগেডের 'ফায়ারম্যান্‌দে'র অগ্নি থেকে উদ্ধার করবার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়, এবং ইডেন গার্ডেন পর্য্যটন করে সাহসের পরিচয় দিতে যায়,— তা হ'লে কেমন হয়?

অর্থাৎ অন্যায় ও অকল্যাণে মানুষের মহত্ত্বের পরিপুষ্টি। পঙ্কোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে পঙ্কজেরও বিনাশ হয়।

উপমাটা ঠিক হল না। পঙ্কজ ত পঙ্ককে বিনাশ করে না। কিন্তু মানুষের মহত্ত্ব কৃতঘ্ন;—যে অশুভ হতে তার পোষণ সে সেই অশুভকেই বিনাশ করার ব্রত সমাপ্ত করে আত্মহত্যা করে।

সুতরাং আমরা সরল মনে অকল্যাণের বিনাশের জন্য মহত্ত্বের মৃত্যুকামনা করতে পারি।

শ্রী কৃত্তিবাস ভদ্র

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক, ১এ, রামকিষণ দাসের লেন, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস হইতে মুদ্রিত ও বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

হোলি

[প্রবাসীর সৌজন্যে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

কালি-কলম

১ম বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৩৩ [১১শ সংখ্যা

উভয়তঃ

শ্রী অরবিন্দ ঘোষ

মানবজাতির জীবনধারায় দুইটি গতি, এক ঊর্দ্ধমুখী, আর এক অধোমুখী—এবং দুইটিই অদম্য অবার্য্য। ভগবান, স্বয়ং নিয়তি যে সাধনার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, তাহার অধোগতি এক স্থানে কিছু সময়ের জন্য স্থগিত হইতে পারে, এমন কি তাহাতে একটা ক্ষণিক ঊর্দ্ধগতি দেখিয়া সেই পথের পথিক আশায় উৎফুল্লও হইয়া উঠিতে পারে; আবার যখন একটা ধর্ম্ম বা আদর্শ বা একটা জাতি সবেগে সগর্ব্বে উঠিয়া চলিয়াছে, তখন শুধু পশু বলে তাহাকে নিমেষের জন্য পিছন দিকে টানিয়া রাখা যাইতে পারে, অসীম পরিশ্রমে তাহার গতিচক্রকে পশ্চাৎ দিকে দুই এক অঙ্গুলী পরিমাণ ঘুরাইয়া দিলেও দেওয়া যাইতে পারে—কিন্তু ভগবানের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা যায় না, জবরদস্তি করিয়া ভগবানকে দখল করা যায় না। যেখানে তিনি স্বয়ং সারথী, জয় সেখানে অনিবার্য্য—যদি তাঁহার রথচক্র কোথাও পিছনে হটিয়া আসে, তার অর্থ প্রতিকূল ভূমি হইতে ঘুরিয়া তিনি দাঁড়াইতে চাহিতেছেন অনুকূল ভূমির উপর। কখন বা তাঁহার অধিকৃত ভূমি হইতে তাঁহাকে তাড়াইতে শত্রু পক্ষকে তিনি নিজে বাধ্য করান, কারণ, সে স্থান পাকাপাকি অধিকার করিয়া রাখা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়, অবান্তর ক্ষেত্রে পিছনে হটিয়া তিনি শত্রুর বলক্ষয় করিতে চাহেন,—যে জয়ে তাহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তাহাই হয় তাহাদের চরম পরাজয়ের কারণ।

কেবল খুঁটিনাটির উপর যাহাদের দৃষ্টি, তাহারা আঙ্গুল দেখাইয়া বলে, "এই যে এই-খানে আমাদের হার হইয়াছে, আর ঐখানে

আমাদের জিত"; আর পরাজয়ের তালিকা যদি জয়ের তালিকা হইতে দীর্ঘ হইয়া পড়ে, তবে হতাশে তাহারা হাল ছাড়িয়া দেয়। এই জন্যেই কর্ম্মের গতি মানুষ বুঝিতে পারে না—চোখ খুলিয়া তাহারা দেখিতে চায় না ছোট ছোট ঢেউ, ছোট ছোট পিছন-টান সব সত্ত্বেও তাহার বৃহৎ ধারা অব্যর্থভাবে চলিয়াছে কোন দিকে। তা'ছাড়া, সাময়িক পরাজয় যেখানে অবশ্যম্ভাবী, সেখানেও শ্রদ্ধার অভাবই সেই পরাজয়কে ডাকিয়া আনে। শ্রদ্ধার দৃষ্টি আর জ্ঞানের দৃষ্টি অবশ্য ঠিক এক বস্তু নয়। শ্রদ্ধা যেখানে মোটা-মুটিভাবে উপলব্ধি করে, জ্ঞান সেখানে স্পষ্ট-ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যক্ষ করে—তবুও মোটের উপরে শ্রদ্ধা ও জ্ঞানকে একই বলা যাইতে পারে, ভক্তের জ্ঞানকে দ্রষ্টার জ্ঞান সমর্থন করে, প্রমাণিত করে। জ্ঞান যতক্ষণ কর্ম্মসিদ্ধির অপেক্ষায় বসিয়া থাকে, ততক্ষণ শ্রদ্ধাই ভগবানের জন্য যুদ্ধ করিয়া চলে; জ্ঞান যতক্ষণ আসে নাই, শ্রদ্ধাই ততক্ষণ একমাত্র আশ্রয়। দিব্যদৃষ্টির জ্ঞান চাই, আর নতুবা চাই অদম্য শ্রদ্ধা—এই দুইটির একটিও না থাকিলে কোন মহৎ সাধনাই সিদ্ধ হয় না।

সুতরাং বস্তুরাজীর মধ্যে রহিয়াছে যে বৃহৎ প্রেরণার ধারা আমরা যেন তাহাকেই দেখি, আর তাহারই আলোকে বুঝিতে চেষ্টা করি সাময়িক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা সব। ঘটনাচক্রের মূল আবেগ চলিয়াছে কোন দিকে—উর্দ্ধ দিকে না অধো-দিকে? যদি অধোদিকেই হয়, তবুও আমা-দিগকে চেষ্টাই করিতে হইবে; কারণ, ধর্ম্মপক্ষের পরাজয় নিশ্চিন্ত বলিয়া তাহা হইতে যে সরিয়া দাঁড়ায় সে অতি হেয় জীব—মানবজাতির সে ঘোর অনিষ্টই করে। যে সব মহৎ সাধনায় মানুষ দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া চলে, মানুষের বীর্য্য ও আত্মদানেই তাহারা সত্য ও সুন্দর হইয়া উঠে, পরিণামে তাহাদেরই বিজয় অনিবার্য্য। আর যে সব কাজ কাপুরুষের দ্বারা সমর্থিত—তেমনি অবহেলায় পরিত্যক্ত হয়, তাহাদেরই কোন ভবিষ্যৎ নাই। মধ্যযুগে ফরাসীদেশে ও ইতালীতে যে জনসাধারণের স্বাধীনতা-প্রয়াস দেখা দিয়াছিল, তখন তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়, তৎপরিবর্ত্তে টিউটনের দেশ হইতে আসিল আভিজাত্যের স্বেচ্ছাচার। কিন্তু সেই একই আন্দোলন আবার যখন মাথা তুলিল, তখন পূর্ব্বাপেক্ষা সে শতগুণ শক্তি লইয়া ফরাসী বিপ্লবকে সৃষ্টি করিল। যে সব জীবাত্মা শত শত বৎসর পূর্ব্বে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়াছিল, তাহারাই যেন বীরবিক্রমে পৃথিবীতে আবার নামিয়া আসিল, বিজয়ী (ফিউডল) আভিজাত্য-তন্ত্রকে শতখণ্ডে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। কিন্তু আমরা জানি, আমাদের যে সাধনা তাহার এখন উর্দ্ধগতি; সুতরাং আমরা নিঃসঙ্কোচে তাহা আশ্রয় করিয়া চলিতে পারি, সামান্য খুঁটিনাটিতে যদি কোথাও পরাজয়ই হয়, তবুও এ কথা নিশ্চয় যে সে পরাজয় জয়েরই পথ পরিষ্কার করিয়া আনিতেছে।

আদর্শ ধরিয়া আমরা চলিবই, কিন্তু তার অর্থ এমন নয়, যে-উপায়-বিশেষ কার্য্যতঃ বিফলতা আনিয়া দিয়াছে, অথবা সাময়িকভাবে সফল হইলেও ভগবান তাঁহার অনুমতি যাহা হইতে সরাইয়া লইয়াছেন সে উপায়ও ধরিয়া চলিতে হইবে। আমাদের স্মরণে রাখা উচিত, আধুনিক

রাষ্ট্র-ক্ষেত্রের যে সব বৃহৎ গতিধারা জাতি-হিসাবে আমরা সে সব লইয়া নাড়াচাড়া করিতে এখনও সুদক্ষ হইয়া উঠি নাই। আমাদের মধ্যে যাহারা সৈন্যসামন্ত শুধু তাহাদেরই নয়, আমাদের সেনাপতি, আমাদের মন্ত্রপতিদেরও পাকা হইয়া উঠিতে হইলে ঘটনাচক্রের সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ে আরও শিক্ষালাভ দরকার, তাঁহাদের প্রয়োজন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। উৎসাহ, উদ্দীপনা, আত্মদান, বুদ্ধির সামর্থ্য, প্রাখর্য্য, উদ্ভাবনী শক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব—এ সবই প্রচুর পরিমাণে আমরা পাইয়াছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে এখনও যাহা অপরিপক্ক অপরিণত তাহা হইতেছে—সেই পূর্ণ অভিজ্ঞতা যাহা অনেক যুদ্ধের ফলে বর্ষীয়ান যোদ্ধার অধিগত হইয়াছে, সেই সূক্ষ্ম রাজনীতিক বুদ্ধি যাহা অনেক দিন ধরিয়া বড় বড় রাজকর্ম্ম, দেশবিদেশের ভাগ্য লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে তবে আয়ত্তাধীন হয়। কিন্তু আমাদের নেতা ও গুরু ভগবান স্বয়ং; যে দেশকে তিনি বরণ করিয়া লইয়াছেন তাহাকে তিনি নিজেই নির্দ্দোষ শিক্ষায়, পূর্ণ সামর্থ্যে প্রস্তুত করিয়া তুলিবেন। শুধু আমাদের দিক হইতে প্রয়োজন, ভুল স্বীকার করা, পথ পরিবর্ত্তন করা, শিক্ষালাভ করা। তাহা হইলেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া অবর্থ্য অবিচলিত গতিতে, বিপুল বেগে লক্ষ্যের দিকে চলিতে পারিব।

তারপর, আমাদের মধ্যে এখনও অনেক দোষ ছড়াইয়া আছে, সেগুলির সংশোধন আমরা করি নাই। সুতরাং সর্ব্বপ্রথম কাজ হইতেছে নির্ম্মমভাবে এ গুলির উপর অস্ত্র প্রয়োগ করা। মানসিক উপকরণ সব যথেষ্ট পরিমাণে আমাদের ত নাই, কিন্তু আধ্যাত্মিক উপকরণও আমাদের নিখুঁৎ নয়। আমাদের নেতাদের, আমাদের নীতদের, দুইএরই একটা গভীরতর সাধনা দরকার,—আমাদের যজ্ঞে আসল গুরু যিনি, দিশারী যিনি, সেই ভগবানের সহিত আরও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে, অন্তরকে একটা উর্দ্ধতর চেতনায় তুলিয়া ধরিতে হইবে, আমাদের চিন্তার ও কর্ম্মের পিছনে আরও প্রবল প্রখর শক্তি জাগাইতে হইবে। পদে পদে ঠেকিয়া কি আমরা শিখি নাই, ইউরোপের মত একটা আস্তিক্যবুদ্ধিশূন্য প্রাকৃত প্রাণের উন্মাদ উত্তেজনা ধরিয়া চলিলে আমাদের জয় হইবে না? আমরা ভারতসন্তান—আমাদিগকে মুক্তি দিবে, মহৎ করিবে ভারতের অধ্যাত্ম প্রতিভা, ভারতের সাধনা, "তপস্যা", "জ্ঞান", "শক্তি"। ভারতের "তপস্যা" ইউরোপের discipline হইতে অনেক বড় জিনিষ। যে ভাগবত শক্তিতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটিতেছে তাহাকে আধ্যাত্মিক সাধনায় আমাদের নিজেদের মধ্যে মূর্ত্ত ও বাস্তব করিয়া তোলাই হইতেছে তপস্যা। ইউরোপের Philosophy হইতে আমাদের "জ্ঞান" অনেক বড়। প্রাচীনেরা যাহাকে বলিতেন দৃষ্টি, আধ্যাত্মিক চক্ষে প্রত্যক্ষ করা, তাহারই ফলে যে সাক্ষাৎ জ্ঞান তাহাই জ্ঞান। আর শক্তি অর্থও ইউরোপের strength নয়—যে বিশ্বশক্তি গ্রহ-নক্ষত্র চালাইয়া লইয়াছে তাহা যখন একটা নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়া ব্যষ্টিভাবে দেখা দিয়াছে তখনই তাহাকে বলি "শক্তি"। ভারত উঠিতেছে, কিন্তু ভারতের ভিতর দিয়া প্রাচ্যের জয় হইবে। তাই

রাষ্ট্রীয় নেতার পশ্চাতে দাঁড়াইবে, বা তাহারই মধ্যে আবির্ভূত হইবে সিদ্ধযোগী। একই আধারে শিবাজীর সহিত রামদাসকেও জন্ম লইতে হইবে, কাভুরের সহিত ম্যাট্‌সিনীকে মিশিয়া যাইতে হইবে। আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি, শুদ্ধি হইতে বিচ্ছিন্ন বল ইউরোপীয় বিপ্লবের সহায় হইতে পারে—কিন্তু ইউরোপের বলে চলিলে আমাদের জয় হইবে না।

গত শতাব্দির সকল প্রচেষ্টা আমাদের বিফলে গিয়াছে, কারণ আমরা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া চলিয়াছিলাম, তাহার পিছনে প্রবুদ্ধ হৃদয়ের প্রেরণা ছিল না। বর্ত্তমান যুগের স্বদেশ-সাধনা এই অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, হৃদয়ের অনুপ্রেরণায় মস্তিষ্কের শক্তিকেও তীব্র-তর তীক্ষ্ণতর করিয়া ধরিয়াছে। কিন্তু আমাদের স্বদেশ-সাধনার মধ্যেও ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। ভাবের দিক দিয়া, আবেগের দিক দিয়া আমরা স্বদেশী হইতে পারিয়াছি বটে, কিন্তু কর্ম্মের বাস্তবের হিসাবে আমরা বিদেশীই রহিয়া গিয়াছি। যে বুদ্ধির সহায়ে আমরা দেশের সেবা করিয়াছি, তাহা নিজেরই মধ্যে নিজে সম্পূর্ণ বলিয়া সীমাবদ্ধ ; তাহাতে স্বচ্ছতা আছে, যাথার্থ্য আছে, নৈপুণ্যও আছে—কিন্তু দিব্য দৃষ্টির দ্বারা অনুপ্রাণিত যে অব্যর্থ জ্ঞান তাহা আমাদের দেশ-সাধনাকে সম্যক পরিচালিত করে নাই। আমরা ভাবুক, কল্পনাপ্রিয়, আদর্শপন্থী হইতে পারিয়াছি, কিন্তু গভীরতর সত্যকে খুঁজিয়া বাহির করিতে, ভগবানেরই ইচ্ছাকে চিনিয়া লইতে যে শিক্ষা দরকার তাহা আমাদের হয় নাই। আমরা বিপুল ভাবাবেগ ধরিয়া চলিয়াছি, কিন্তু সকল রকম হৃদয়োচ্ছ্বাস হইতে মহত্তর ও খরতর যে নির্ম্মল তপোবল, যে চক্ষুষ্মান আত্মস্থ শক্তি তাহার সন্ধান তেমন পাই নাই। আমাদের স্বদেশ-সাধনাকে হয় শুদ্ধ হইয়া উঠিতে হইবে, একটা নিবিড়তর সত্য আবিষ্কার করিয়া আরও উচ্চতর দিব্য প্রেরণায় চলিতে হইবে ; আর না হয়, পুরাতন দেহ সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া, নূতন দেহ ধরিতে হইবে। ঘটনাচক্রের ধারা দেখিয়া মনে হয়, শেষোক্ত পথেই যেন সে চলিতেছে। কিন্তু দুইএর যে পথেই চলি না কেন, পরিণামে জয় অবশ্যম্ভাবী।

সকল ঘটনার মধ্য দিয়াই কিছু দিন হইল আমরা যেন শুনিতেছি অন্তরের শ্রীগুরু আমা-দিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "আগে ত্যাগ কর, তবে সঞ্চয় করিতে পারিবে ; আমার ইচ্ছানুসারে কাজ কর, নিজেকে জান, শুদ্ধ হও, খেয়ালের পিছনে ছুটিও না।" যাহার শুনিবার ক্ষমতা আছে, সেই যেন কান পাতিয়া শোনে। নিজের সহিত নিজের আদান-প্রদান ছাড়া, নিজের ভিতরের আলোক ছাড়া জ্ঞান আসিবে না—এমন কি, বাহিরের কাজে সফলতার জন্য দরকার যে পথ নির্দ্দেশের জ্ঞান, সে জ্ঞানও নয়। এই শিক্ষা-টুকু আমাদের যতদিন না হইবে, ততদিন নীচের অল্পজ্ঞানের আলোকে যে পথেই যতটুকুই চলি না কেন, তাহা ব্যর্থ হইবেই।

দক্ষিণেশ্বরে যে কাজ সুরু হইয়াছিল তাহা শেষ হওয়া ত দূরের কথা, লোকে তাহার মর্ম্ম এখনও গ্রহণ করিতে পারে নাই। বিবেকানন্দ যাহা পাইয়াছিলেন, যাহা বিকশিত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, সে জিনিষ এখনও ত

বাস্তবে মূর্ত্তি লয় নাই। ভবিষ্যতের যে সত্য বিজয় গোস্বামী নিজের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার শিষ্যদের কাছে নিঃশেষ ব্যক্ত হইয়া যায় নাই। যে দিব্য জ্ঞান দেখা দিতে চলিয়াছে তাহা কিন্তু তেমন গোপন নয়, যে শক্তির আবির্ভাব হইতেছে তাহা আরও বাস্তব, আরও শরীরী—কিন্তু সে বস্তু কোথায় আসিবে, কবে আসিবে—কে বলিতে পারে?

অনুবাদক—শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত

নীপুদা

শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

নীচে একটা গোলমাল হচ্ছিল শুনতে পাচ্ছিলাম।

উড়িয়া ঠাকুর অপূর্ব্ব হিন্দিতে চেঁচাচ্ছিল—"নেই, নেই—এ গেরস্ত বাড়ী নেই হায়, এ বাবুদের মেশ্ হায়—এখানে গিন্নি-লোক থাকে না—বাহার যাও—এখানে ভিখ্ মিলবে না…"

চণ্ডীবাবু স্নানের ঘর থেকে তাঁর স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে ধমক দিচ্ছিলেন, "এই ও খবরদার—উধার মাৎ যাও—হিঁয়া সাধু-সন্ন্যাসী লোককা খাতির নেহি হায়।"

আরো অনেক প্রকার হিন্দির নমুনা ওপরে এসে পৌছোচ্ছিল। মেশের এতজনের যে হিন্দিতে দখল আছে তা আগে জানতাম না।

ওপরে যে ক'জন ছিলাম কৌতূহলী হয়ে বারান্দার রেলিঙের ওপর দিয়ে একবার মুখ বাড়িয়ে দেখতে গেলাম!

ন'টা বাজে; সুতরাং নীচের উঠানে আপন আপন শ্লীলতার আদর্শ হিসাবে নগ্নতার নানা স্তরে পৌছে আফিসযাত্রীদের তেল মাথার ধূম পড়ে গেছে। এবং এই সম্মিলিত স্নানযাত্রীদের হিন্দির স্রোতের মুখে পড়ে গেরুয়াধারী মুক্তকচ্ছ সন্ন্যাসী-গোছের একটি লোক হতভম্ব হয়ে কি একটা কথা বলবার যেন অবসর খুঁজছে।

হিন্দিস্রোতে ক্ষণিকের জন্যে ভাঁটা পড়তে কল্পিত হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী পরিষ্কার বাংলায় বল্লে, "আমি সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

সূয্যবাবু সকল বিষয়ে অগ্রণী; কিন্তু কিছু দিন হ'ল অম্লশূলের জন্যে সন্ন্যাসীপ্রদত্ত মাদুলী ধারণ করা অবধি সাধু-সন্ন্যাসী সম্বন্ধে মনোভাবের পরিবর্ত্তন করেছেন। এতক্ষণ সেই জন্যেই কথায় ও কাজে কোনপ্রকার বৈরাচরণ থেকে বোধ হয় নিবৃত্ত ছিলেন। এইবার সুযোগ পেয়ে বল্লেন—"সুধীরবাবু কেউ নেই বাপু এখানে, সুবোধবাবু আছে, সুরেশবাবু আছে, আমি স্বয়ং সূর্য্যবাবু আছি, সুদখোর শুঁটকো সুবলবাবু পর্য্যন্ত ছিল—কিন্তু সুধীরবাবু ত কেউ নেই…"

হাসাহাসির মাঝে চেঁচিয়ে বল্লাম, "আছে মশাই আছে, আমার ডাকনাম সুধীর।"—কথাটা রসিকতার প্রয়াসেই বলেছিলাম। কিন্তু সন্ন্যাসী হঠাৎ আমার দিকে ফিরে দু'টি অত্যন্ত আরক্ত চক্ষু তুলে বল্লে,—"এই যে—!" এবং আর বাক্য ব্যয় না করে সোজা বাঁয়ের ওপরে আসবার সিঁড়িতে উঠে পড়ল।

আমি কিন্তু মোটেই চিনতে পারলাম না। লোকটা

ওপরে উঠে এলে একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, "কি চান ?"

লোকটা কেন বলতে পারি না কাঁপছিল। পাশের তক্তপোষটার ওপর ধপ করে বসে পড়ে আমার দিকে আরক্ত চোখ দু'টি সবিস্ময়ে তুলে বল্লে, "আমায় চিন্‌তে পারলি না ?—আমি নীপুদা !"

নীপুদা !

বিশ্বাস না হবার কথা বটে। সে সুগৌর রঙে কে যেন কালী মাখিয়ে দিয়েছে, উজ্জ্বল সদা-স্মিত চোখ দু'টি কোটর-প্রবিষ্ট জবাফুলের মত রাঙা, তার কোলে কালী পড়েছে, বিবর্ণ মুখে একরাশ কাঁচাপাকা দাড়ি ও মাথায় ধূলি-ধূসর রুক্ষ এক মাথা জটা। সে-দিনের সে সুপুষ্ট সুগঠিত দেহের মাংস শিথিল হয়ে যেন হাড়ের কাঠামে কোন রকমে ঝুলে আছে। এ যেন নীপুদার ছায়া।

মুখ থেকে আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল—"এ কি হয়েছ নীপুদা !"

অত্যন্ত ক্লান্ত একটু ক্ষীণ হাসির আভাস বোধহয় সে পাণ্ডুর মুখের ওপর দিয়ে সরে গেল। তক্তপোষের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে নীপুদা বল্লে, "এ তোর তক্তপোষ ত ?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করেই ধূলি-ধূসর পা দুটো ওপরে তুলে বল্লে,—"দেখ্ দিকি কতগুলো লেপ-কাঁথা জোগাড় করে আনতে পারিস চট্ করে—।"

তারপর উবুড় হয়ে হাত দুটো বুকের ভেতর গুটিয়ে কাঁপতে কাঁপতে নীপুদা আরক্ত চোখ বুজল এবং খানিক বাদে দুটো লেপ ও দুটো তোষক ভাল করে মুড়ি দিয়ে বল্লে,—"হাঁ, এখন আর ঘণ্টা তিনেক আমায় বিরক্ত করিসনি—খানিকটা জল-সাবু করে রাখিস।"

কিন্তু তিন ঘণ্টা বাদে পথ্য নিয়ে নীপুদাকে যখন জাগাতে গেলাম নীপুদা গাঢ়রক্তবর্ণ চোখ তুলে এক অদ্ভুত বিকৃত মুখভঙ্গি করে বল্লে, "বিশ্বাস করিস্ না মুখ দে আগুন বার করতে পারি ?—এই দেখ—ফু—হা…"

এবং ডাক্তার এসে বল্লে—"সিরিয়াস কেশ্—ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট টাইপ অফ্ ম্যালেরিয়া"—এবং আরও অনেক জটিল কিছু।

এবার বোধ হয় নীপুদাকে নিয়ে কিছু দিনের মত পড়া গেল। আমার জ্ঞানে কখনও তাকে অসুস্থ দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

* * *

বিকারের ঘোর ও বেহুঁশ অবস্থার ভেতর দিয়ে নীপুদার দিনরাত্রি যায়। ডাক্তারের মুখ দেখে আশা হয় না। রোগশয্যার পাশে বসে পুরাতন দিনের কথা মনে পড়ে।

বিশ বছর আগে এ মেশ এই বাড়ীতে সেই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিল। চোখে দেখিনি—শুনেছি, ভূতের বাড়ী বলে বাড়ীটার ভাড়াটে আসত না, ঝোপে ঝাড়ে জঙ্গলে প্রকাণ্ড বাড়ীটা উচ্ছন্ন যেতে বসেছিল। সেই সময়ে নাম-মাত্র ভাড়ায় নীপুদা বাড়ীওয়ালার কাছে বাড়ীটি নিয়ে প্রতিবেশীদের অনুরোধ নিষেধ অগ্রাহ্য করে উপরো-উপরি এক সপ্তাহ এখানে রাত্রিবাস করে ভূতের অমূলকতা প্রমাণ করে দেয়।

তা সত্ত্বেও এ বাড়ীর ভূতের অপবাদ দূর করতে ও ভালো করে মেশ বসাতে বছর দুই লেগেছিল।

মেশ হবার দশ বছর বাদে, পাড়াগাঁয়ের ছেলে, নিজের কথায় প্রাদেশিক টান ও সহরের সভ্য রীতি-নীতির অজ্ঞতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে, মরিয়া ও সঙ্কুচিত এই দুই মিশ্রিত যে এক অপরূপ মনোভাব নিয়ে প্রথম সহরে এসে ওঠে, ঠিক সেই মনোভাব নিয়ে সস্তা সীট্‌রেণ্টের খাতিরে এই মেশে এসে উঠেছিলাম। পাছে কেউ অবজ্ঞা করে এই ভয়ে সর্ব্বদা অবজ্ঞার দৃষ্টি নিয়ে ফিরতাম এবং পাছে কেউ কথা না কয় সেই ভয়ে কারুর সঙ্গে কথা কইতাম না।

কিন্তু মেশে আসবার কয়েক দিন বাদেই খাবার ঘরে

সকলের সঙ্গে খেতে বসে নীপুদা যখন তার স্বভাবসুলভ উচ্চহাস্যের সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ ভারাক্রান্ত পাতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বলেছিল—"ওহে ম্যানেজার, একটা চার্জ্জ ধরো, কিন্তু দোহাই ভাই, এ্যাপ্রেন্টভারের সাত খুন মাফ—আমার পাতের দিকে চোখ বুজে থেক।" সেদিন কি কারণে বলতে পারি না বিনা পরিচয়ে বেশী খাওয়ার সম্বন্ধে ইঙ্গিত, এই অমার্জ্জনীয় অপরাধেও মোটেই অসন্তুষ্ট হতে পারিনি এবং প্রথম সকলের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিয়ে ছিলাম।

নীপুদার উচ্চকণ্ঠে একটি সরল আন্তরিকতা ছিল। শুধু তাই নয়—নীপুদার চারিধারে এমন একটি রহস্য ছিল যা তরুণ মনকে অনুরক্ত না করেই পারে না। একটিমাত্র জিনিষের সে বড়াই করে বেড়াত—"ওরে, ফিফ্থ ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়েছি, আমার কাছে ইংরিজি ফড়ফড়াস্‌নি; মাষ্টারের গায়ে পানের পিচ ফেলে স্কুলে ইস্তাফা দিয়েছিলাম।" কিন্তু কবে কোথায়—মেশের কেউ জানতাম না। জিজ্ঞাসা করবার সুযোগও সে কখন দেয় নি। এই মেশের সে প্রতিষ্ঠা করেছিল এই পর্য্যন্ত সবাই জানতাম, তার পূর্ব্বের জীবনের ওপরকার যবনিকা নীপুদা কখন তুলত না। একদিন কৌতূহল দমন করতে পারিনি—অন্যায় আগ্রহ ভরে নীপুদার অনুপস্থিতিতে তার হাতবাক্স লুকিয়ে খুলে দেখেছিলাম—অনেকগুলো কাগজপত্রের মধ্যে একটি-মাত্র কাগজ প্রথম তুলে পড়েছিলাম।

—কবে কোন রেলের কারখানায় রহিম বক্স বলে কে ফায়ারম্যানের কাজ করেছিল তারই প্রশংসা-পত্র—!

দেখলে সবই দেখতে পারতাম। কিন্তু বাক্স বন্ধ করে দিয়েছিলাম, আর এগুতে সাহস হয়নি।

তারপর পাঁচ বছর একসঙ্গে একঘরে কাটিয়ে নীপুদাকে দেখবার অনেক সুযোগ পেয়েছিলাম। ধারণা ছিল যে তাকে বুঝতেও পেরেছি। ভেতরে প্রাণ থাকলে কম বয়সের বকাটে ডান্‌পিটে ছেলেরা বড় হয়ে যা হয় নীপুদা তার বেশী কিছু নয়। এই ধরণের আত্মীয়-স্বজনহীন বেপরোয়া দরদী লোকেরা যা করে থাকে নীপুদা তাই করত।—অর্থাৎ জাত বেজাতের মড়া পুড়িয়ে, অস্পৃশ্য রুগীর সেবা করে, ন'শ নিরেনব্বুই বছরের কড়ারে টাকা ধার দিয়ে, বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াত। আমি আসবার আগে কালীঘাটের মন্দিরে কোন গরীব কুমারী মেয়ে কুড়িয়ে নিজের যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে, লোকের কাছে ভিক্ষা করে ও সাধ্যাতিরিক্ত দেনা করে তার বিয়েও নাকি দিয়েছিল। নীপুদার সঙ্গে যে পাঁচ বছর কাটিয়েছি সে পাঁচ বছর ধরে নীপুদা সে দেনা শোধ করেছে।

দেনা-শোধের ব্যাপারটা আমার অলক্ষ্যেই চলত। দৈবাৎ জানতে পেরেছিলাম।

কিছু দিন ধরে দেখছিলাম নীপুদার আসবাবপত্র হাল্‌কা হয়ে আসছে। নীপুদার মেয়েদের মত ঘর সাজাবার সখ ছিল। মেশের ছোট ঘরখানি সে নানান্ সৌখীন আসবাবপত্রে একেবারে ভর্ত্তি করে রেখেছিল। এই নিয়ে মেশে অনেক হাসাহাসিও হয়েছে।

নীপুদা বলত, "তোদের বৌদি আসবেরে; কে আর জোগাড়-যন্ত্র করবে বল্—নিজেই করছি।"

কিন্তু কয়েক মাস থেকে অনাগত বৌদির প্রতীক্ষায় ধৈর্য্য হারিয়েই বোধ হয় আসবাবপত্রগুলি একে একে মুটের মাথায় কোথায় যে অন্তর্হিত হচ্ছিল, বুঝতে পারছিলাম না।

জিজ্ঞাসা করাতে নীপুদা জানায়, কোন বন্ধুকে দেখাতে নে যাচ্ছে। ভাল কথা। কিন্তু এত লোভী স্বার্থপর বন্ধু নীপুদার কোথায় এতদিন ছিল জানতাম না। দেখতে চেয়ে ফেরৎ দেবার কথা তাদের কখন মনে থাকত না।

দামী দামী টেবিল চেয়ার আলমারী ফুলদানী ইত্যাদি সব গিয়ে শেষে বড় আয়নাটাও যেদিন মুটের মাথায় চাপল সেদিন আর থাকতে পারলাম না; বল্লাম, "অনেক জিনিষ ত তোমার বন্ধুরা দেখলে নীপুদা, নিজেদের মুখগুলো আর নাই তাদের দেখালে—তারা ভয় পাবে।"

খানিক দাঁড়িয়ে নীপুদা কি ভাব্‌লে, তারপর ঈষৎ

হেসে বল্লে, "দেখ্ তবে বাঙাল, তুই-ই মুখ দেখ্—কিন্তু আমায় কুড়িটা টাকা দে, আজই চাই।"

"তা দিচ্ছি; কিন্তু সত্যি কথাটা বলবে কি নীপুদা? মদ খাও না, রেশ্ খেল না, বদখেয়ালি নেই, ধার দেওয়া ছাড়া খরচ করবার কোন ফিকির জান না, কিসের তা হ'লে এত টানাটানি তোমার?"

"বদ্-খেয়ালি নেই তুই জানিস্?" বলে নীপুদা মুটে বিদায় করে দিয়েছিল।

পরে জানিয়েছিল—মেয়ের বিয়ের ঋণ।

এই পাতানো মেয়ের কথা নীপুদার মুখে অনেকবার শোনবার সুযোগ হয়েছিল।

অত্যন্ত লম্বা কদাকার একটি জোয়ান লোকের সঙ্গে একদিন ঘরে ঢুকে নীপুদা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল—"ওরে, আমার জামাই দেখ্।"

জামাইকে কেন জানি না দেখবামাত্র আমার অপছন্দ হয়েছিল; এক একটা লোককে হয়। লোকটার নোংরা ময়লা জামা-কাপড়গুলো পর্য্যন্ত যেন তার গায়ে ভালো করে বসতে আপত্তি করছিল।

জামাই অত্যন্ত বিনয়ী; সঙ্কুচিতভাবে ঘরে ঢুকে খাটের গদিটা সরিয়ে একটুখানি জায়গায় আলগোছে বসে মেয়ে মানুষের মত অত্যন্ত সলজ্জভাবে বল্লে, "আপনি ধন্য, দেবতার সঙ্গে এক ঘরে বাস করছেন।"

তার জোয়ান ছ'ফুট চেহারার জন্য এই মেয়েলিপনা আরো বিশ্রী লাগছিল।

উত্তর দিতে পারলাম না।

'তোমরা গল্প কর, আসছি—' বলে নীপুদা জামাই-এর অভ্যর্থনার আয়োজন করতেই বোধ হয় বেরিয়ে গেল।

লোকটা বসে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে নীপুদার অসীম মহত্বের কথা এমন করে বলতে লাগল যে, নীপুদাকে না জানলে তাকে সাক্ষাৎ শয়তান বলেই ধারণা হ'ত।

... ...

যাবার সময় জামাই ক'টা টাকা চেয়ে নিয়ে গেল—মেয়ের অসুখ, কিছু ওষুধ-পথ্য কিনে নিয়ে যেতে হবে। গেলে পরে নীপুদাকে বল্লাম, "মাফ্ কর নীপুদা, তোমার মেয়েকে ভাগ্যবতী ভাবতে পারলাম না—খবর নিয়ে দেখো ও তোমার মেয়েকে প্রহার পর্য্যন্ত করে।"

অদ্ভুতভাবে আমার দিকে খানিক চেয়ে থেকে নীপুদা বল্লে, "এক ঘণ্টার আলাপেই একটা মানুষকে বিচার করে ফেল্লি?"

বলেছি যে ধারণা ছিল নীপুদাকে বুঝেছি, কিন্তু যেদিন পাঁচ বছরের পর মেয়ের বিয়ের ঋণ শোধ করে হঠাৎ এক দিন নীপুদা একটা গুরুতর অপবাদ স্কন্ধে নিয়ে মেশ থেকে অন্তর্ধান হ'ল সেদিন সকলের চেয়ে তাকে বেশী বুঝেছিলাম বলেই স্তম্ভিতও হয়েছিলাম সকলের চেয়ে বেশী।

সব চেয়ে মুস্কিল হয়েছিল এই যে, এ অপবাদকে অমূলক ভাববার কোন সুযোগ আমার ছিল না। থাকলে মনকে প্রবোধ দিতে পারতাম।

কিন্তু ভেবেও কোন কূল-কিনারা পাই নি। যে পরের দায়ে ঋণ করে' পাঁচ বছর ধরে সে ঋণ সর্ব্বস্বান্ত হয়ে এক বেলা খেয়ে শোধ করে সে কেমন করে, তার পরম বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে সামান্য একশ'টা টাকার জন্যে!

এই বন্ধুটির নীপুদার ওপর শ্রদ্ধা আমার চেয়ে একবিন্দু কম ছিল না এবং সেই জন্যেই নীপুদাকে পুরাতন কাজ ছাড়িয়ে নিজের বৃহৎ ইট-খোলার ম্যানেজারিতে সে অনুরোধ করে নিযুক্ত করেছিল।

দু' মাস সেখানে কাজ করার পর শুনলাম—নীপুদা একশ'টা টাকা ভেঙে উধাও হয়েছে; এবং শুধু একশ' টাকা সরিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, ইট-খোলার সমস্ত দাদন দেওয়া কুলিকে পালাবার পরামর্শ ও সুযোগ দিয়ে বৃহৎ ব্যবসায়টির একেবারে সর্ব্বনাশ করে দিয়ে গেছে।

পাঁচ বছর আর নীপুদার কোন সংবাদ পাইনি।

*   *

*

রোগশয্যার পাশে বসে এই সব পুরাতন কথাই ভাবি।

বিপদ কেটে গেছে। নীপুদা সারবার মুখে চলেছে, কিন্তু এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল। বিছানা থেকে ওঠা এখনও নিষেধ।

রুগ্ন শীর্ণ দেহটির পানে চেয়ে মনে হয় সে নীপুদা আর নেই যেন। শুধু চেহারারই তার পরিবর্ত্তন হয়নি, স্বভাবও বদলে গেছে।

একদিন ঘরে ঢুকে অপ্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। নীপুদা ডেকে বল্লে, "পালাস নি, এ চোখের জল পড়ল বলে আমার যত লজ্জা, তোর দেখতে পাওয়ার লজ্জা কি তার চেয়েও বেশী রে?"

নীপুদাকে কেমন করে বোঝাব—চোখের জল সব খানেই পীড়া দেয়; দুর্ব্বলের বেলা করুণা করে না হয় স্বস্তি পাই, কিন্তু যেখানে করুণা করা ধৃষ্টতা মনে হয় সেখানে যে চোখের জল মানুষের অসহ্য হয়ে ওঠে।

আরো ভাবি সে কত বড় নিদারুণ ব্যথা যা ওই ভবঘুরে অসাধারণ লোকটির চোখ থেকেও অশ্রু আনতে পারে?

সে কি ব্যথা? সে কি গ্লানি? কি সে?

নীপুদা শুয়ে শুয়ে দিন রাত কি যেন ভাবে।

মাঝে মাঝে ডাকে, কি একটা কথা যেন বলতে চায় মনে হয়, কিন্তু বলে না। অন্য কথা পাড়ে।

বলে হয়ত—"শক্ত অসুখের পর ইন্দ্রিয়গুলো আরো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে না রে?"

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলে যায়, "অনেক দিন উপোষের পর দেহের মত মনের ক্ষিদেও খুব বেড়ে যায় বোধ হয়। এত ছোটখাট জিনিষ আগে কখন লক্ষ্য করেছি বলে মনে পড়ে না, আজকাল তাতে এমন আনন্দ পাই—!"

একটু থেমে বলে, "পোকাটা কড়িকাঠ কুরে' গর্ত্ত করছে শুনতে পাচ্ছিস্?—ওই একঘেয়ে শব্দটুকুও ভাল লাগে আমার; শুনে শুনে ক্লান্তি হয় না।"

তার পর একেবারে চুপ করে।

খানিক বাদে আবার ডাকে…

নীপুদার জ্বরটা আবার পাল্টে এল।

ডাক্তারকে বিদায় করে যখন ঘরে ফিরে এলাম, বাতির নাতিস্পষ্ট আলোতেও আমার মুখের দিকে চেয়ে কেমন করে না জানি বুঝে নীপুদা ম্লান হেসে বল্লে, "তুই যেমন পাগল, ডাক্তারদের কথায় বিশ্বাস করিস্—এত সহজে মরব-না রে!"

তারপর বল্লে, "রংপুরে একটা খবর দে!"

রংপুরে পাতানো মেয়ের কাছে খবর গেল।

এই কথাটাই বলতে নীপুদার এত দ্বিধা?

সকাল না হতেই নীপুদা বল্লে, "ঘরটা বড় নোংরা হয়ে আছে না রে, একটু পরিষ্কার করিয়ে ফেল্ দিকি।"

একবার ডেকে বল্লে, "দেখ্ দিকি জ্বরটা বোধ হয় মগ্ন হয়ে গেছে।"

দেখে বল্লাম, "না—হয়নি।"

খানিক বাদে আবার ডেকে বল্লে, "আচ্ছা, আর্শিটা নিয়ে আয় দেখি—!"

বল্লাম—"আর্শি কি হবে নীপুদা এখন?"

অত্যন্ত অসহিষ্ণু ভাবে বল্লে, "সব কথাতে তর্ক করিস্ কেন বল্ত?"—আর্শিতে মুখ দেখে বল্লে, "বাঃ, এ যে খাশা চেহারা হয়েছে রে জটাগুলো কেটে!" আর্শিটা ফিরিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে বল্লে, "আজ আসবে লিখেছে—হয়ত নাও আসতে পারে, কি বলিস্? ট্রেণ ফেল্‌ও ত হ'তে পারে—!"

খানিক কড়িকাঠের দিকে চেয়ে কি ভেবে বল্লে, "এত

হাঙ্গাম করে আসতে না বল্লেই ভাল হ'ত। তোর টাকা-গুলো জলের মত খরচ হচ্ছে।"

নীপুদার এই অত্যন্ত সাধারণ দুর্ব্বল দিকটির পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধা কমে না, বরং বেড়ে যায়।

পাতানো মেয়েই হোক আর সত্যিকারের মেয়েই হোক, নারী আসছে রোগের সংবাদ পেয়ে!

সুতরাং কান্না-কাটি ইত্যাদি হবে জেনে এক রকম প্রস্তুত হয়ে ছিলাম, তবু মেশের ভেতর মেয়েছেলের কান্না-কাটিটা মেশের লোকেরা কি রকম ভাবে গ্রহণ করবে ভেবে মনে একটু অস্বস্তিও ছিল।

কিন্তু নীপুদার পাতানো মেয়েকে দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। বিয়ের নিমন্ত্রণ রাখতেও এর চেয়ে সাজ-সজ্জার দরকার হয় না। তাম্বূলরঞ্জিত অধর মৃদু হাস্যে ঈষৎ ফাঁক করে যে সুসজ্জিতা এবং সুন্দরী—মিথ্যা বলতে পারব না—মেয়েটি গাড়ি থেকে নামল, পরমহিতৈষী গুরু-জনের গুরুতর রোগের সংবাদে ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসার কোন চিহ্ন তার কোথাও নেই।

একদিন নীপুদার জামাইকে দেখে বিরূপ হয়েছিলাম আজ তার পাতানো মেয়েকে দেখে সমস্ত গা ঘৃণায় রী রী করে উঠল। একটু কাণ্ডজ্ঞান পর্য্যন্ত কি এই নির্লজ্জ মেয়েটির নেই? রোগশয্যার বেদনাকে উৎসবের বেশে অপমান করতে এল সে কি বলে?

মনে পড়ল, মেয়েটাকে কালীঘাটের কুমারীদের ভেতর নীপুদা কুড়িয়ে পেয়েছিল বটে!

জোয়ান কদাকার জামাইটি সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বিনিয়ে বিনিয়ে কি বলছিল শুন্‌তেও পাইনি। এই মেয়ে জামাই-এর প্রতি অনুরাগের জন্য নীপুদার ওপব পর্য্যন্ত রাগ হচ্ছিল।

মেয়েটি হাসিমুখে ঘরে ঢুকে বল্লে, "ওমা, কি বিচ্ছিরী চেহারা হয়েছে তোমার গো!"

নীপুদার মাথার কাছে একটু গিয়ে বস্‌ল, আবার তখনি উঠে পড়ে আর্শিটার কাছে দাঁড়িয়ে বল্লে, "আর্শিটাত ভারী সুন্দর!" খোঁপাটা একবার হাত দিয়ে ঠিক করে নিলে। নীপুদার দিকে ফিরে আবার জিজ্ঞাসা করলে, "এতদিন কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছিলে বল ত?" এবং উত্তরেব অপেক্ষা না করেই জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে বল্লে, "ওমা, পেছনে আবার একটা পুকুর আছে!"

চৌকাঠের কাছ থেকে ফিরে নীচে নেমে গেলাম। পায়ের শব্দে বুঝলাম জামাইও পেছনে আসছে।

সমস্ত ক্ষণের মধ্যে নীপুদা একটিও কথা কয়নি।

মেয়েটির লজ্জাহীনতা বুঝতে পারি, হৃদয়হীনতা বুঝতে পারি না।

ভাল করে তার সম্বন্ধে কিছু জানি না। শুধু জানি —নীপুদা একদিন কালীঘাটে গিয়ে একপাল দুরন্ত অসভ্য দরিদ্র কুমারী মেয়েব ভেতর ওই মেয়েটির বিশেষত্ব দেখে আকৃষ্ট হয়। নীপুদার মুখে যা শুনেছি তাতে ধারণা হয়, এখনকার রূপের কিছুই তখন উপযুক্ত আবেষ্টনেব অভাবে ফুটতে পাবে নি। দুর্ব্বল ক্ষীণ দেহে লক্ষ্য কববাব মত ছিল মাত্র দুটি ডাগর উজ্জ্বল চোখ আর তাব অত্যন্ত সপ্রতিভ ব্যবহার। নীপুদা বলেছিল, "ব্যবহার তাব এত বেশী সপ্রতিভ যে সন্দেহ হয়, যেন কুণ্ঠা ঢাকবাব জন্যে সে সব মেয়েকে টেক্কা দিয়ে অসভ্যতা করছে।"

আর সব মেয়েরা পয়সা চেয়ে কোলাহল করেই ক্ষান্ত ছিল। এ মেয়েটি এসে একেবারে পকেটে হাত দিয়ে বস্‌ল। ধমক দিতে অন্য মেয়েগুলো হেসে সরে দাঁড়া'ল। এ মেয়েটি দমল না, বরং উল্টো ধমক দিয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু সমস্ত মুখ তার হঠাৎ হিঙুলের মত রাঙা হয়ে উঠল।"

তারপর নীপুদা সন্ধান নিয়ে জেনেছিল, মেয়েটিব বাপ নেই; ভায়ের তথাকথিত আশ্রয়ে মা মেয়েটিকে নিয়ে থাকে। কালীঘাটের পেছনে, সুড়ঙ্গের মত অন্ধকার ও নোংরা যে গলিগুলি শ্যাওলা ও নোনা-ধরা পুরাতন ইটের

জমাট জটলার ভেতর দিয়ে লক্ষ্যহীন ভাবে ইতস্ততঃ গেছে, তারি একটির পাশে পায়রার খোপের মত সঙ্কীর্ণ মুমূর্ষু দু'কুঠুরী-ওয়ালা একটি কোঠা-বাড়ীতে তাদের বাস। নীপুদা বলেছিল, "বাড়ীটাকে দেখলেই মনে হয় যেন তার নাভিশ্বাস উঠেছে। ক্ষয়ে-খাওয়া আল্কাতরা-মাখান বৃদ্ধ কড়িগুলো ছাদের ভারে নুয়ে পড়েছে। ছাদের টালি কয়েক জায়গায় মারাত্মক রকমে ঝুলে পড়েছে। এবং সমস্ত ঘরে বদ্ধ বাতাস ও শ্যাওলার একটা ভাপ্‌সা অসহ্য গন্ধ।

বাড়ীর বাসিন্দাগুলি কিন্তু বাড়ীর হুবহু প্রতিচ্ছবি। বৃদ্ধ মামাটি হাঁপানির ব্যায়রামি। মনে হয় যেন তার পাঁজরার খাঁজে খাঁজে নোনা ধরেছে। মা'টিকে দেখলে পাতা-ঝরা শুকনো সজনে গাছের কথা মনে পড়ে।"

তারপর নীপুদার সেখানে আলাপ করতে কোন অসুবিধাই হয়নি। মেয়েটির বাপ যখন ছিল তখন অবস্থা তাদের নাকি খুব ভাল না হলেও চলনসই ছিল।

কিন্তু অমিতব্যয়ী বাপের মৃত্যুর পর মাথা গোঁজবার জায়গাটুকু পর্য্যন্ত তাদের নাকি দেনার দায়ে গেছে। মামা স্বীকার না করলেও নীপুদা বুঝতে পেরেছিল, এখন ওই মেয়েটির কালীঘাটে ভিক্ষা-করে-আনা রোজগারই তাদের সংসার চালাবার একমাত্র না হোক প্রধান সম্বল।

এর বেশী নীপুদা কিছু আমায় কখন জানায় নি। তবে বাইরে অন্য সূত্রে জেনেছিলাম, নীপুদা মেয়েটির ভিক্ষায় বেরুন বন্ধ করে দেয়। অনাত্মীয়ের সাহায্য নিতে মামা ও মা বিশেষ সঙ্কুচিত হয়েছিল বলে মনে হয় না।

মেয়েটি উপযুক্ত হলে নীপুদা তার বিয়ে দিয়েছিল ও তার সঙ্গে কন্যা-সম্বন্ধ পাতিয়েছিল—এ ছাড়া আর কিছুই এ সম্বন্ধে জানি না। জানবারই বা আর কি আছে?

দুঃখ হচ্ছিল শুধু আজ এই ভেবে যে, নীপুদার জীবনের একটিমাত্র স্নেহের ক্ষুধাই এমন অপাত্রে পড়ে অপমানিত হল।

ঘণ্টা দু'এক বাদে ওষুধ খাওয়াতে ওপরে গিয়ে দেখলাম—নীপুদা গম্ভীর মুখে কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শুয়ে আছে। মেয়েটি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে কি দেখছিল সেই জানে।

পায়ের শব্দে ফিরে দাঁড়িয়ে মুখে যেন অত্যন্ত জোর করে হাসি টেনে মেয়েটি বল্লে, "কই, এই ত তোমার সুধীর এসেছে, চেনা করিয়ে দাও—।"

নীপুদা মৃদু হেসে বল্লে, "আলাপ করবার আগেই ত তুই নাম ধরে ফেল্লি, আর সুধীর কি তোকে চেনে না? ওরে সুধীর, এর নাম বুড়ি, বুঝলি?"

মেয়েটি আবদারের স্বরে বল্লে, "না গো সুধীরদা, আমার নাম শোভা।"

নীপুদার সঙ্গে আমিও জোর করে হাসলাম। কিন্তু মনে হচ্ছিল আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন বেসুরো। কোথায় যেন খিচ্ বাধছে।

ওষুধ দিয়ে ফিরে আসছিলাম, শোভা ঘর থেকে পেছন পেছন বারান্দায় বেরিয়ে এসে ডাকলে, "সুধীরদা!"

থেমে একটু বিরক্ত হয়েই বল্লাম, "কি?"

শোভা পাল্টে ভ্রূকুটি করে বল্লে, "ওঁকে বলুন, আজ রাত্রে বাড়ী যাওয়া হবে না।"

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তার মানে?"

"তার মানে এখানে থাকব। পারেন ত একটা বিছানা জোগাড় করে দেবেন। না পাবেন অম্‌নিই শোব ঘরের মেজেতে।"

শোভা বলে ফিরে যাচ্ছিল। পেছন থেকে ডেকে বল্লাম, "এটা আমার বাড়ী নয়, মেস্, একথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? মেসের লোকেরা ভাববে কি?"

শোভা ফিরে অত্যন্ত তীক্ষ্ণস্বরে বল্লে, "মেস্ ত হয়েছে কি? এটা মানুষের মেস ত, জানোয়ারের ত নয়!"

নীপুদার ঘরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠ পৌঁছেছিল বোধ হয়—। জিজ্ঞাসা করলে, "কি হ'ল বুড়ি?"

শোভা পলকে কণ্ঠ পরিবর্ত্তন করে বল্লে, "হয়নি কিছু—সুধীরদার সঙ্গে একটু ঝগড়া করছি।"

"বাঃ বেশ, এক মিনিট না ভাব হতে হতেই ঝগড়া!"

"ক' মিনিটই বা আছি—এরই মধ্যে সব সেরে নিতে ত হবে।"

আর কিছু না বলে নীচে নেমে গেলাম।

সকাল বেলা দেখলাম আর এক রূপ।

কাল রাত থেকে নীপুদার জ্বরটা ছেড়ে গেছে। সকাল বেলাও দেখলাম 'নর্ম্মাল'।

শোভা বল্লে, "দেখলে, আমি তোমার ওষুধ, এলুম আর জ্বর ছেড়ে গেল।—এইবার কিন্তু আমায় যেতে হবে—সুধীরদা একটা গাড়ি ডাক।"

শোভা অস্থিরের মত ঘরময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

নীপুদা বল্লে, "সে কি রে! আজ বিকেল পর্য্যন্ত অন্তত থাক্।"

পায়চারি করতে করতেই শোভা মাথা নেড়ে বল্লে, "উহুঁ—উহুঁ।"

"কি এমন মস্ত গিন্নি হয়েছিস্, একবেলা থাকতে পারিস্ না! আমরা কি কেউ নই?" বলে নীপুদা হাস্‌ল।

"পরের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে এখন মায়া-কান্না কাঁদলে শুনব কেন!" বলেই জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে বল্লে, "আচ্ছা সুধীরদা, এ পুকুরটায় মাছ আছে?" তৎক্ষণাৎ আবার জানলার কাছ থেকে সরে এসে ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে বল্লে, "আচ্ছা, ঘর সাজাতে কি নিয়ে যাব বল ত? ওই ব্রাকেট্টা, আর ওই ছবিটা, আর এই আয়নাটা দেবে ত?—দেখ।"

"ও সব যে সুধীরের—"

"যারই হোক্, আমার লুট্ করতে আসা, পেলেই হল! কই সুধীরদা, গাড়ি ডাক্‌তে গেলে না?"

এতক্ষণের মধ্যে পলকের জন্যে শোভা এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়ায় নি।

বেরিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলাম নীপুদা বল্‌ছে, "লুট্ করতে আসা—হ্যাঁরে?"

শোভার উত্তরটা শুন্‌তে পেলাম না।

... ...

যাবার সময়েও অম্‌নি অস্থিরতা!

বল্লে, "দেখ সুধীরদা, ভাল মনে জিনিষগুলো দিচ্ছ ত? রাস্তায় যেন আবার সব ভেঙে না যায়।"

নিজেই বুঝতে পারছিলাম না কেন তার ওপর আর কোন বিরক্তি নেই। হেসে বল্লাম, "আমার জিনিষগুলো আমি ভাল মনেই দিলাম। আয়নাটা নীপুদার, ওটার কথা উনি জানেন।"

এ আয়নার কথা মনে করে নীপুদা আমার দিকে চেয়ে হাস্‌লে।

শোভা বল্লে, "আর ত কিছু লুট্ করবার মত পাচ্ছি না।"

"আমায় লুট্ করে নিয়ে যা না—" বলে নীপুদা হাস্‌তে লাগ্‌ল।

হঠাৎ অকারণে গম্ভীর হয়ে উঠে শোভা বল্লে, "তুমি খুব উপহাস করতে পার, জানি।" এবং পরমুহূর্ত্তেই হেসে বল্লে, "বড্ড ঝগড়া করতে ইচ্ছে করছে। কার সঙ্গে ঝগড়া করি বল ত সুধীরদা?"

জামাই দরজায় এসে দাঁড়িয়ে জানালে—গাড়িতে সমস্ত জিনিষ-পত্র তোলা হয়েছে। জামাই কাল থেকে একবারও কিন্তু ঘরে ঢোকে নি।

নীপুদার পায়ের ধুলা নিয়ে ও আমায় নমস্কার করে শোভা বল্লে, "আসি তা হলে!"

কিন্তু চৌকাঠ পর্য্যন্ত গিয়েই হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে, "ওমা, বাপের বাড়ী থেকে যেতে গেলে কাঁদতে হয়—না?"

এবং ছুটে এসে নীপুদার খাটের পায়ের কাছে হাঁটুগেড়ে মুখটা নীপুদার দুটো পায়ের ভেতর গুঁজে বসে পড়ল।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। নীপুদা যেমন ছিল তেমনি কাঠ হয়ে শুয়ে রইল।

নিঃশব্দ কান্না। মুখ দেখতে পাওয়া যায় না। শুধু মনে হচ্ছিল, মেয়েটির সমস্ত দেহ কিসের আবেগে ঢেউয়ের মত দুলে দুলে উঠছে।

পাঁচ মিনিট অমনি কাটল। হাসিমুখে যখন সে উঠল তখন তার চোখের জল মোছবার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও সিক্ত চোখের পল্লবগুলি আষাঢ়ের আকাশের মত ভার হয়ে আছে।

ছোট্ট আর্শিটা তুলে নিয়ে হেসে বল্লে, "দেখলে, ওই জন্তে ত কাঁদতে চাই নি, কাঁদতে গিয়ে গেল আমার খোঁপাটা নষ্ট হয়ে।"

কেউ কোন উত্তর দিল না। জামাই খবর দিয়েই চলে গিয়েছিল, আবার এসে নীপুদার পায়ের ধূলো নিয়ে বেরিয়ে গেল।

শোভা পেছন পেছন বেরিয়ে গেল আর কোনদিকে না চেয়ে।

* * * *

নীপুদা ডাক্তারের ভয় উপহাস করে সত্যিই সেরে উঠল। এবং একদিন ঝোলাঝুলি গুটিয়ে বল্লে, "চল্লাম রে!"

কোথায়—জিজ্ঞাসা করা বৃথা বলে জিজ্ঞাসা করি নি।

যাবার আগে একদিন নীপুদা কি কথায় হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলেছিল,—

"ইট্‌খোলার কুলিগুলো কলেরায় সাবাড় হয়ে যাচ্ছে—তখনও ভাবছি বিশ্বাসঘাতকতা করব বন্ধুর সঙ্গে! ভাড়ার টাকা দিয়ে পালাতে না দিলে একটা প্রাণীও বাঁচে না—তখনও নিজের সঙ্গে যুঝছি—চুরি করব বন্ধুর টাকা!—বাজারে মহত্ত্বের এম্‌নি মোহ!"

খানিক থেমে ভিন্ন স্বরে বলেছিল, "উঁচু দিকে নজর রেখে উঠ্‌লেই কি পথ ভোলবার ভয় এড়ান যায় রে? দেবতা হতে গিয়ে দেউলেও হওয়া যায় মানুষের মহিমা না বুঝে……"

অপরিস্ফুট হোক্, অস্পষ্ট হোক্, আমি জানি—নীপুদার জীবনের এইটুকুই টীকা।

পিয়াসী

হাফেজ

চমৎকার প্রভাত। আকাশে মেঘের সমারোহ, বন্ধু, মদ কই? মদ কোথায়?

রক্ত-রঙিন্ ফুলের ওপর শিশির পড়েছে বন্ধু, মদ দাও।

উপবন থেকে স্বর্গের সুরভি মর্ত্ত্যে এসেছে, আনন্দে বিভোর হয়ে মদিরা পানের এই ত' সময়।

শাখায় শাখায় ফুলের আসন পাতা—সোনার সিংহাসন বন্ধু। ধরো—ধরো, অগ্নিবর্ণ মদিরা গ্রহণ কর।

তোমার ওই সুন্দর মুখ, মুক্তার মত দাঁতের পাঁতি,—লোকের ত' ভাল লাগে না বন্ধু। বুক যাদের পুড়ে গেছে,—তাদের সেই পোড়া বুকের পোড়া ঘায়ে নুনের ছিটে বলে' মনে হয়।

মদিরালয়ের দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে—দ্বারী। দ্বার খোলো—দ্বার খোলো।

…সুরা-কুটীরের দুয়ার বন্ধ করবার এই কি সময় নাকি ?

উন্মত্ত হয়ে সুরা পান কর তুমি হে বৈরাগী। আর জ্ঞানী যে, সে খুঁটি আঁকড়ে' পড়ে' থাক্—ভগবানের ভয়ে কাঁপুক্ না সে থর্ থর্ করে'—তোমার কি ?

অমৃতের অভিলাষী যদি হও ত' বাজাও—বাজাও তানপুরা, আর প্রাণ ভরে' সুরা পান কর।

সম্রাট সেকন্দারের মত জীবন প্রার্থনা কর যদি, তবে ধর—ধর বন্ধু ধর সখার গলদেশ বেষ্টন করে'—আরক্তিম ঠোঁটে শুধু ঠোঁট মিলিয়ে পড়ে' থাকো।

পান কর—পান কর বন্ধু, আজি এই নব বসন্তে সুরা পান কর। পরম সুন্দর এই পানপাত্র-দাতার সুমুখে ধর ধর তোমার পাত্রটি তুলে ধর বন্ধু।

তোমার চিন্তা কি হাফেজ, ভাগ্যলক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন বুঝি ওই খোলে।

কবলুতি

শ্রী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

*　　*

*

বচর ফিরলো না—কপাল ফিরলো। কোন্ গতির প্রভাবে বুঝলুম না। আহ্নিক গতিরও নয়, বার্ষিক গতিরও নয়,—বোধ হয় দুর্গতির! 'সেরেস্তা' মুঠোর মধ্যে এসে গেল। চৌধুরীমশায়ের 'দক্ষিণ-হস্ত' দাঁড়িয়ে গেলুম। যা-কন্নি তাই,—দস্তখৎ চলতে লাগল'। সবাই মন রেখে চলে,—অবশ্য মুড়কি বাদ। তিনি মেজাজ রেখে চলেন।

সেকেলে লোকের কথা মিছে হয় না—মুড়কি যে তাঁর মেয়ে নন—ছেলে, সেটা দিন দিন সুস্পষ্ট হতে লাগলো। বেড়াতে বেরুলে—কৈফিয়ৎ দিতে হয়; দেরি হলে মুড়কি-রাণী খুড়কি দেন,—ক্রমে সড়কি চালাবার ভাব। আমাকে চোখ রাঙান, শাসান, দাবিয়ে রাখতে চান। জমিদারের আদুরে মেয়ে—ইচ্ছাটাকেই আদেশ বলে ভাবেন।

দূর করো—আর না। চৌধুরী পেয়েছেন—পেট-ভাতার ম্যানেজার, আর মুড়কি ভাবচেন—আধা বিষয়ের গাধা।

ত্যাগের পথ এগিয়ে আসতে লাগল'।

কিছু টাকা চাই—মুড়কির কড়ি নয়।—'যাদৃশির্ভাবনা যস্ত'—একটা কথা আছে; দেখা যাক।

*

চৌধুরীমশাই মাস দুই বাড়ী নেই,—পুরী গেছেন। ফেরাটা—আজকাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আহারান্তে মুড়কি-রাণীকে বললুম—"একবার তীর্থে বেরুব' ভাবছি।"

"কী ?—তীর্থ ?—কেনো ?"

"ধর্ম্মকর্ম্মে কি 'কেনো' আছে! হাজার তিনেক

টাকা আর বাড়ালুম,—তার মানে তো বোঝো। সেই পাপটা জগবন্ধুর ঘাড়ে চাপিয়ে সাফ হয়ে আসছেন তোমার বাবা। জগবন্ধু তো নিজে বইবেন না—ওস্তাদ ছেলে, সেটা ঠিক্ আমার ঘাড়েই ঘুরিয়ে দেবেন। তারপর—আমি ফেলি কোথা! অর্দ্ধেকটা তোমার প্রাপ্য বটে,—কিন্তু আমি তো অন্ধ নই,—রোজ পাঁচ-পো ক'রে পেনিটির গুপো মেরে কুপো বনে বসে আছ,—ওর ওপর বইবেই বা কি করে—সইবেই বা কেনো!"

মুড়কি গব্যরস ছাড়া অন্তরস বড় বুঝতেন না,—রূঢ় কণ্ঠে বললেন—"তোমার পয়সায় তো খাই না—তার পিত্তেসও রাখি না।"

"এ-তো সুখের কথা! তবে কি না—হিঁদু কবলাতে হলে, শাস্ত্রও মানতে হয়, আর শাস্ত্র মানতে হলে— তোমার আধখানা আমার ভাগেই পড়ে। দুর্ভাবনাটা তাই, সুতরাং তীর্থে না গেলে নয়।"

"মুরোদ্ ভারি! পয়সা দেবে কি এই গৌরী সেনের তালুক?"

"ধর্ম্মতঃ উচিত বটে।"

দিনের বেলা আহারান্তে রূপোর ডিবে করে এক ডিবে পান বরাদ্দ ছিল,—সেইটে নিয়ে সেরেস্তায় এসে বসতুম। কাদী-ঝি দিতে আসছিলো। বল্লেন—

"ডিপেসুদ্ধ দিতে হবে না—ও-থেকে চারটে পান বের করে দে।"

কাদী হুকুম তামিল করলে। রাণী ডিবেটি নিজে নিয়ে রাখলেন।

বুঝলুম,—বেচে-না বেরিয়ে পড়ি! হাসতে হাসতে বললুম—"এক পিপে পাপ, পাঁচ টাকার ডিপেয় কুলোয় না!"

কি বলতে যাচ্ছিলেন,—নিশ্চয়ই মধুরতর কিছু, চাকর এসে খবর দিলে—"কলকাতা থেকে দু'জন বাবু এসেছেন, আপনাকে দরকার।"

বাইরে চলে গেলুম।

* *
*

আগন্তুক ভদ্রলোক দুটির বয়স বেশী নয়—ছাব্বিশ-সাতাশের মধ্যে। দু'জনেই সুপুরুষ, কৃশকায়, চোস্তো কেতা-দুরস্ত পরিচ্ছদ। আমলাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইচেন,—কস্তুরীর সুগন্ধ ছাড়ছে।

আমি যেতেই দাঁড়িয়ে উঠলেন,—সঙ্গে সঙ্গে—"নমস্কার হরেনবাবু!"

বুঝলুম,—আমার পরিচয় আমলাদের কাছে পেয়েছেন।

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বললুম—"আসুন-আসুন—এই ঘরে আসুন।" এই বলে নিজের আপিস-রুমে নিয়ে গে বসালুম।

দু' চার কথায় বুঝে নিলুম—আমলারা আমার অনুকূলেই পরিচয়টা দিয়েছে: যেমন লেখাপড়ায় তেমনি কাজ-কর্ম্মে, কর্ত্তার দক্ষিণ-হস্ত, যা-করি তাই, অর্দ্ধেক বিষয়ের ভাবী-অধিকারী। অপর পক্ষে—সদরালার উপযুক্ত পুত্র,—ইত্যাদি।

বেয়ারার মার্ফৎ পান চেয়ে পাঠালুম। ডিপে এল না—পাথরবাটী করে পান এলো। মনে মনে লজ্জিৎ হলুম—লাগলোও। বললুম—"এঁদের সব বনেদি বন্দোবস্ত, পবিত্রতা রক্ষার দিকেই নজর, নূতন কিছু চালাবার জো নেই।"

তাঁরা হেসে বললেন—"তাতে হয়েছে কি—এই তো বেশ,—এই তো চাই। গরীব দেশের পয়সা কেবল বিদেশে বিলোনো বই ত' নয়। সেদিন একটি গান শুনলুম—

"কুইন গো—আমরা চাইনা বিলাতী বাসন,
আমাদের থাক্ গয়াশ্বরী।"

খুব ঠিক কথা। আমরাও ওই উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি।"

"বলুন না শুনি, আমিও যদি দেশের কোনো কাজে লাগি,—ধন্য হয়ে যাব'। বড় দুঃখ—বড় অভাব!"

হৃদেন্দ্রবাবু বললেন—"আমাদের উদ্দেশ্য যদি সফল নাও হয়—দুঃখ করব না। একদিন তা যে হবেই তার ইঙ্গিৎ আজ পেয়েছি। সেইটাই আজকের বড় লাভ। আপনার কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছি। এমন পল্লীগ্রামের মধ্যেও যে দেশের দুঃখ ভাববার মত একটি হৃদয়ও আছে, একথা কোনোদিন ভাবতে পারিনি।"

বললুম—"এতে আশ্চর্য্য হবার কি পেলেন? দেশের মঙ্গল চিন্তা—মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নয়, কি?—"Breathes there a man with soul so dead!"

হৃদেন্দ্রবাবু বললেন—"অধিকাংশই তাই হরেনবাবু—অধিকাংশই তাই। তা না তো আমাদের এ দুর্দ্দশা কেন'! এখানে soul নিয়ে বেজায় সোরগোল আছে বটে, তবে বাঁচবার breathing নেই, যা আছে তা মরবার—সেটা দীর্ঘশ্বাস আর অস্তিমের শ্বাসটান! তাকে বাঁচবার পথে মোড় ফেরাবার চেষ্টাতেই বেরিয়েছি। কিছু টাকা না হয় যাবে,—আর যাবেই বা কেন,—দেখি দেশের লোকের যদি নেশা ধরে। সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা।"

"এখন আপনাদের ইচ্ছাটা কি শুনি।"

সঙ্গী প্রকাশবাবু বললেন—"দেশের কোটী কোটী টাকা এক দেশালায়েতেই সাগর পারে চলে যাবার সূত্রপাত দেখছি। এই সময় যদি উঠেপড়ে লাগা যায়—তাব কতক-টাও দেশে থাকে। সুফল দেখাতে পারলে হাজার দিকে হাজারো কল বসে যাবে। বিলেত থেকে দেশালাই আসতে আরম্ভ হয়েছে। সাগর পারে যিনি পদার্পণ করেন তিনিই আগুন লাগান! গন্ধক আর প্যাকাটির পালা সাঙ্গ হয় বলে। তাই আমরা মনস্থ করেছি—একটি দেশালায়ের কল প্রতিষ্ঠা করে ও বালাইকে বাধা দেবো।"

হৃদেন্দ্রবাবু বললেন—"অন্তরায় কিন্তু অনেক। প্রধান হচ্ছে—কাট পাওয়াই কঠিন। কাটগুলি সরল হবে, সুদৃঢ় হবে, হালকা হবে, সহজ-দাহ্য হবে—এমন কাট দরকার। সংবাদ পেয়েছি—শিমুল কাট একাজের খুব উপযোগী। সেই কাট প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করে তবে কলে হাত দেওয়া। কল বন্ধ রেখে লোকের মাইনে গুণতে ত' পারা যাবে না। অনুসন্ধানে জানলুম—আপনাদের গ্রামটি শিমুল-গাছ-প্রধান, আশে-পাশেও আছে—আসবার সময় তা লক্ষ্যও করেছি। ঐ সমস্ত শিমুলগাছগুলি আমাদের দিইয়ে দিতে হবে,—আমরা খরিদ করতে চাই। এতে আপনার সাহায্যই আমাদের একমাত্র ভরসা। মঙ্গলময়ই আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন।"

আমাকে চিন্তিত আর নীরব দেখে বললেন—"চুপ করে রইলেন যে!"

"ভাবচি—এ idea (খেয়াল) আপনারা পেলেন কোথায়? Thought-current (চিন্তা-স্রোত) কি একই সময়ে different centreএ (বিভিন্ন কেন্দ্রে) আঘাত দিয়ে যায়? হাঁ—তা আশ্চর্য্য কি!—plane (ক্ষেত্র) যদি তা receive (গ্রহণ) করবার উপযোগী হয়—সমভাবাপন্ন হয়,—হবে না কেন? কিন্তু তাতে ভাগ্যহীনেরা বড়ই ব্যথা পায়, হতাশ হয়ে পড়ে। এটা যে আমার আজ দু' বচরের idea!"

"বলেন কি—দু'বচরের! উঃ—আপনাকে পেলে—কি বল প্রকাশ?"

প্রকাশবাবু বললেন—"এখন তো' পেয়েছি।"

"ধন্য মঙ্গলময়!"

বললুম—"হিঁদুয়ানী হিঁদুয়ানী করেই দেশটা মোলো। সুইডেন্ গিয়ে ও বিদ্যেটা বাগিয়ে আসব' বলে প্রস্তুত, বাবা বেঁকে বসলেন,—প্রায়শ্চিত্ত করলেও নাকি পিণ্ড পৌঁছয় না! শ্বশুরও বাধা দিতে কসুর করলেন না। কাজেই তাঁর সেরেস্তায় বস্তাপচা হচ্ছি! তবে—সঙ্কল্প ছাড়িনি, টাকার উপায় হলেই বেরিয়ে পড়বো। আপনাদেব সঙ্কল্প শুনে দমেও গেলুম, আনন্দও হচ্ছে। কি আশ্চর্য্য—শিমুলগাছটা পর্য্যন্ত মিলে যাচ্ছে!"

"হ্যাঁ—শিমুলগাছের কথাও ভেবেছিলেন নাকি! এটা যে secret (গুহ্য) কথা।"

বললুম—"জগতে secret কিছু নেই, সবই নিজের মধ্যে মজুদ, একটু মাজলে-ঘসলেই বেরিয়ে পড়ে,—সাধু ভাষায় আপনারা যাকে বলেন—সাধনা। আমি মাঠে ঘুরছিলুম—দেশালাই মাথায় ঘুরছিল। হঠাৎ দেখি মাঠের সীমা-রেখায় অগ্নি-শিখা! দ্রুত এগুলুম,—তখন দেখি, কতকগুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাতা-ঝরা শিমুলগাছ রক্তপুষ্পাঞ্জলি নিয়ে খাড়া! কার উদ্দেশে? একটা মৌমাছিও তো জোটে না! ভাবনা ধরলো। মাথায় এলো—বৈদ্যুতিক বেগগুলো extremity (শেষ সীমা)

খোজে,—ডগায় ডগায় এ অগ্নিবর্ণ ফুলগুলো অগ্নিগর্ভ গাছেরই ইঙ্গিৎ—দেশালায়ের দ্যোতনা।”

হৃদেন্দ্রবাবু প্রকাশবাবুর দিকে চেয়ে, দক্ষিণ ভ্রুটা উঁচিয়ে বিস্ফারিত নেত্রে বললেন an acquisition (রত্ন লাভ)।”

প্রকাশবাবু বাধা দিয়ে বললেন—“God sent (ভগবৎ কৃপা)।”

কথায় কান না দিয়ে বলেই চললুম—“ফিরে এসে দু'খানা গাঁয়ের বড় বড় শিমুলগাছ পিছু একটাকা করে দাদন দিয়ে, ১৩৭টি গাছ কব্জায় করলুম। মূল্য—সাপটা সাতটাকা করে,—কাটাই খরচ আমার। টাকাটা আজ দু'বচর আটকা পড়ে রয়েছে—”

হৃদেন্দ্রবাবু বাধা দিয়ে বললেন—দেশের কাজ ভেবে, ও গাছগুলি আমাদের দিয়ে দিন হরেনবাবু। আপনি দেখছি দেশালাই সম্বন্ধে অনেক-কিছু ভেবেছেন, আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ,—সদিচ্ছার উত্তেজনাই আমাদের সম্বল। আপনি হতাশ হবেন না, আপনাকে এর মধ্যে থাকতে হবে,—আপনার পরামর্শ মত আমরা চলব। এটা কোম্পানী নয়—Brotherhood (ভায়ার দল)। আজ থেকে আমরা 'ব্রাদার'—(ভেইয়া)।”

বললুম—“আপনারা আমাকে ভাবালেন। আমার ইচ্ছা,—আগে কাজটার হদিস্ হাসিল করে আসি—”

“বেশ তো, এ দিকের সব ঠিক্‌ঠাক্ করে দিয়ে বেরিয়ে যাবেন,—সে খরচা Brotherhood বহন করবে ব্রাদার্।”

“আচ্ছা—চলুন আগে গাছগুলো দেখাই।”

এই বলে—যার যেখানে যত শিমুলগাছ ছিল দেখিয়ে, তাতে খড়ির ঢ্যারা মেরে এলুম।

বললুম—যে দিন সুবিধা হয় কাটুরে এনে কাটিয়ে নেবেন,—একটি কথাও কেউ কইবে না। সবই আমার দাদন দেওয়া সওদা—অধিকাংশই নিজেদের। হাতে টাকা না থাকলেও আটকাবে না,—অন্যের গাছগুলোর টাকা আমি না হয় দিয়েই রাখবো।”

হৃদেন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি পকেটে হাত পুরে বললেন—“এই যে ব্রাদার—কিছু টাকা আমার সঙ্গেই আছে—রাখুন। বাকি টাকা আগামী রবিবার পাবেন, সেই দিন লোকজন নিয়েও আসবো।”

এই বলে, খুচরোতে নম্বরিতে চারশো টাকা বার ক'রে দিলেন। লেখাপড়ার কথা তুলে লজ্জাই পেলুম।

তাঁরা আশা উৎসাহ নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। আমি চিন্তা নিয়ে ফিরলুম :—তাই ত' বড় ভদ্র-সজ্জন যে,—মন যে চায় না! প্রথমটা মজা ভেবে—এ কি অভাবনীয় ব্যাপার! কার শিমুলগাছ কে কাটবে! এ খেলা নিশ্চয়ই ভগবানের—তা না তো গোদাবরী তীর ছেড়ে এ সব “বিশাল শাল্মলী তরু” এখানে মরতে আসবে কেনো,—আর তার টাকা আমার পকেটেই বা ঢুকবে কেনো! তবে আমারো দরকার, শাস্ত্রও বলচেন—আতুরে নিয়ম নাস্তি। হ্যাঁ—বাপ বটে ভগবান! আমরা তাঁর বৃদ্ধ বয়সের বৎস,—আবদার ধরলেই আদায়,—একেই বলে বাপ। যে ক'দিন আছি—বেঁচে থাকুন!

দেখি মুড়কি-রাণীর ভাবটা,—এখন তাঁর ওপরই আমার ভদ্রতা অভদ্রতা নির্ভর করচে।

* * *

ফিরে দেখি—সেরেস্তার অবস্থা বদলেছে,—বেশ একটু ভাবান্তর! জমা-খরচের খাতা আর আদায়-উশুলের টাকা মুড়কি-মঞ্চে দাখিল হয়েছে!

গিয়ে—হাসতে হাসতে বললুম—“সাধ্বি—এত দিন চিনতে পারিনি, ক্ষমা কোরো। আমরা হৈ চৈ করেই মরি, তোমরা নিঃশব্দে এগিয়ে পড়। স্বামীকে ধর্মকর্মে সাহায্য করবার এই যে গোপন আগ্রহ, আর ঐ সঙ্গে শুভ অনুমতি দান,—এটা কি ভোলবার কথা! বিলেত এত বড় হল আর কিসে,—সহধর্ম্মিণীর সাহায্য পেয়েই না!”

“কিসের অনুমতি?”

“এই—তীর্থে যাবার গো।”

“হুঁ—যাওনা দেখি! চৌধুরী বাড়ীর পয়সা এত সস্তা নয়! বাবাকে চেন তো,—কোথাও কারুর গিয়ে রক্ষে

নেই। সাধু সদ্দার খাজনা বাকি রেখে সেই পেঁড়োয় পালিয়ে ছিল ;—সেই রাজ্যি থেকে' বেঁধে এনে কি-হাল্ করেছিলেন জান তো ?"

মুড়কি-রাণীর ধারণা—পেঁড়ো পেরিয়েই জগৎটা ফুরিয়ে গেছে। জগতের সেই শেষ সীমা থেকেও তাঁর বাপ সাধু সরদ্দারকে ধরিয়ে এনেছিলেন, আর যা করেছিলেন,—সেটা—থাক্‌গে।

বললুম—সাধু সদ্দারদের সর্ব্বত্রই ওই দশা ; আমি তো আর সাধু সদ্দার নই—পুরো অসাধু সদ্দার। তুমি নিশ্চিন্ত থাক—ভেবে আর কাহিল হয়োনা।"

"রাগ বাড়িওনা বলচি !"

"কেন—খাবেনা নাকি !"

মুড়কি-রাণী দ্রুত বেরিয়ে গেলেন,—অবশ্য নীরবে নয়,—কিছু বলতে বলতেই গেলেন, যার ভাবার্থ—কারুর পয়সায় তো খাই না !

চেয়ে দেখি,—ঘরের দামী এবং অস্থাবর আসবাব সরানো হয়ে গেছে !

যদি ভাবি,—আমাকে চক্ষের আড়াল না করবার টান্, তাতে মস্ত একটা সুখ আছে। তাই ভেবে রাতটা কাটিয়ে দেওয়াই ভালো। রাতটা কাটলো বটে, কিন্তু যথা—"কাট কাটে বস্ত্র কাটে !"

রাণী দেখা দিলেন না। কাদী-ঝি এসে বহুৎ সদুপ-দেশ দিয়ে গেলেন :—বাপ দেখলে না,—শ্বশুর ঘাড় পেতে নিলেন,—একটু নীচু হয়ে চলাই ভালো,—ভগবানের ভুল—রাণী তো সত্যি মেয়ে নয়,—তার আদরেই আদর। তোমার হাত আছে—তার পা আছে,—রাগ মারতে কতক্ষণ ! সে সন্তুষ্ট থাকলে—ভালো হবে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে বেড়াবে,—ইত্যাদি।

প্রাতে উঠে—সেরেস্তাকে সেলাম ঠুকে—কলকেতার রাস্তা ধরে রওনা হয়ে পড়লুম।

জগন্নাথ-ঘাটে কেশ মুণ্ডন—অবশ্য মাইনাস্—কেশব ভারতী। বড়বাজারে বেশ পরিবর্ত্তন—গেরুয়া গ্রহণ। পরে গঙ্গা পার হয়ে দেশত্যাগ—পত্নী included (উহ্যির মধ্যে)। ফলে—ত্যাগের ডবল্ প্রমোশন্ লাভ।

* *

*

কাশী পৌঁছে দেখি—নবরত্ন হাজির—খাঁটি স্বদেশী। সকলেই চক্রের 'মেম্বার্'—ভৈরব ! কাঁচায় পাকায় হৃষ্টপুষ্ট, —গৈরিকের ওপর রুদ্রাক্ষ, তদুপরি সিন্দূরের 'সাইন্ বোর্ড্' ! সকলেই মুক্তকচ্ছ এবং "খলু ভাগ্যবন্ত" ! বায়ুর ক্রিয়া করেন—তাই ফুলেল তেল মাখেন,—মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়,—আর "সুধা খান জয়কালী ব'লে"।

পাঁচ দিনেই পরিচয় পেকে উঠলো।

যৌবনে আমার চেহারাখানা বোধ হয় মন্দ ছিল না, তায় ঝাড়া সাড়ে তিন হাত আড়া। জহুরী জহর চেনে,—সবাই 'ডেরার' খোঁজ নেয় ! 'সঙ্গে কেউ নেই' বললে—বিশ্বাস করেনা। অল্প দিনেই আভাস পেলুম—বাবণ মার্কাই বেশী ! ওয়ারেণ্টের আসামীরা উঁচিয়ে চলেন,—কাশীতে কুলোয় না,—পাঞ্জাবে পাড়ি ধরেন। আর যা, তা আমারি স্বতীর্থ—ক্যাস্ ভাঙা ব্যাস,—ভ্রাতৃজায়ার আর বিধবার অর্থ বাগিয়ে বেরিয়েছেন। মধু দেখে মন্ত্র দেন—অবশ্য অনুগ্রহ ক'রে। কেউ গ্রহ খণ্ডনে আর কবচে ওস্তাদ্, কেউ হাত দেখায় সিদ্ধ হস্ত। ওষুধটা সবাই জানেন, এক একটি পারাভস্মের প্রফেসার। এ কষ্ট পর-হিতার্থেই করে থাকেন,—মেয়েরাই সেই পর। তাঁদের মুণ্ডেই ষোড়শোপচার চলে। বেশ আছেন। দেশে এ খাতির আর তোয়াজ তিনশো টাকা আয়েও মেলেনা।

আমার পোষালো না। লুচি রাবড়ী চলছিল মন্দ নয়, কিন্তু হৃদেন্দ্রবাবুর ভদ্রতা আর সরলতা স্মরণ হলেই—সব তিক্ত হয়ে উঠতো, দেহ মন অস্বস্তিতে ভরে যেত'। মুড়কিই তখন মনের বল যোগাতো—তার পাতিব্রত্যই মন বেগড়াতে দিত না। অসময়ে—দুর্বৃত্তের বন্ধু।

তখন ভাবতুম—চারশো টাকা তাঁদের পক্ষে কিছুই নয়—আমার কিন্তু মস্ত উপকারে লেগেছে। ভবিষ্যতে বুঝবেন—আমিও তাঁদের কম উপকার করিনি।

দেশের প্রতি মমত্বই তাঁদের উন্মত্ত করেছে! অনভিজ্ঞ ভাল মানুষের টাকায় কেবল কল বসতে পারে—ফল ফলে না। মুখপাতের এই চারশো টাকার ওপর দে ফাঁড়া কেটে গেলে—লাক্ টাকা ফাঁক্ হবেনা। রবিবাবুর জীবন-স্মৃতির জাহাজের খোলটার মতই ওই কল্টাও অচল হয়ে বিফল হ'ত,—শেষ আরো কিছু দিয়ে বিদেয় করতে হ'ত। ভালই করেছি! ও সব ঝঞ্ঝাট্ কি আমাদের জেনানা-জাতের ধাতে সয়? আমরা শব্দ-ব্রহ্ম, আর পারি—ওই যা আগের প্যারায় আছে,—তোফা জিনিস্!

তবু আমার তা সইল না। কেবলি মন বলতে লাগল —সাধুর চেয়ে সাধুচরিত্র ভালো! সুদেন্দ্রবাবুর সহাস সমর্পণ, দেশের দরদ, সম্ভ্রান্ত স্বরূপ—আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলছিল। 'বেড়াই যেন'—গেরুয়া-ঢাকা চোর! চোর ত' বটেই—চোরের গায়ে গেরুয়া কেন? সইতে পারছিলুম না—ফেললে যেন বাঁচি!

কম্‌রেডরা (comrades—মাসতুতো ভ্রাতারা) পোছে—"কামাইটা কতো,—তিন, সাত না সাগরযাত্রী"— অর্থাৎ—জেল্ না দ্বীপান্তর! কেউ পোছেন—"হাজারী-লাল না লাকপৎরায়"? ইত্যাদি। তদ্ভিন্ন যেন গেরুয়ার অধিকার আসেনা!

তারাই তাড়ালে! গেরুয়ার গতি করতে প্রয়াগে পালালুম। ভাবলুম—একটা কাজকর্ম্ম জুটলে করি।

যা হোক্—দিন কতক স্বস্তিতে কাটলো,—দিশী-সাধুর উৎপাৎ ছিলনা।

* * *

রং থাকলে তুরুপ চলে,—চাকরির চেষ্টা চলে না। বেণী ঘাটে বেশ বদ্‌লে বাবু সাজলুম। স্বচ্ছন্দ বোধ করলুম,—গায়ে যেন মলয় বাতাস লাগলো। এতদিন সত্যই জেল-ভোগ হচ্ছিল।

অকস্মাৎ বাঁ-দিক থেকে, গাঁজার গলায়, আওয়াজ এসে চম্‌কে দিলে:—"কি বাবা, barred by limitation (মেয়াদের বেড়া) টপকালে বুঝি!"

চেয়ে দেখি—দাড়ি গোঁফ জটার সমবায়ে সিদ্ধিমার্কা এক বেঁটে খেঁটে, কৃশ্র শ্মশ্রু, গজস্কন্ধ সাধু, পদ্মাসনে বসে এই প্রশ্ন ছেড়েছেন!

তাঁর দিকে চাইতেই ইঙ্গিতে ডাকলেন। বললেন— "সৌভাগ্যোদয়ের দিনে স্বদেশী সাধুকে কিছু দিয়ে যাও বাবা—বড় হাবড়ে পড়ে গেছি।"

"আপনাদের আবার হাবড় কি?"

"কচি ছেলে,—পাতালের পাত্তা পাওনি তো। হাবড় সকলেরি আছে বাবা,—আবার যে যত বড় তার তত বড়,—সাধু যে! সাধ্বী সরে গেলেন—সন্ধ্যে ক'রে, অকালে, —কেঁচে গণ্ডুষের পথ মেরে। বেশ ছিলুম—কপোত কপোতী যথা। কেতার কম্‌তি ছিল না—সেতার বাজাতুম, সব ছিঁড়ে খুঁড়ে বেতার হয়ে গেল। আবার গছিয়ে গেলেন—তপস্যার ফল! একদম্ লগ্ন চাঁদা! সাধুর বাচ্চা, অল্প বয়সেই জ্ঞানের অধিকারী হয়ে পড়লো। যাতে হাত দেয়, তাই সোনা; রাজার হালে রাখলে। কিন্তু জ্ঞানী বাচ্চা বাইরে থাকতে চাইলে না—পুণ্যভূমি খুঁজলে। সুবিধে ক'রে চট্ট সাধনোচিত ধামে—তোমাদের সাধু ভাষায়—জেলে, চলে গেল।

"তারপর এই দেবতার বেশে—অর্থাৎ উলঙ্গ,— আদুড় গায়ে বাদুড় হ'নে—ভগবান ধরে ঝুলচি, আর সঙ্গমের হাওয়া অঙ্গমে ঢোকাচ্চি। আকাশ-বৃত্তি নয়—ভূ-বৃত্তি,— সামনে ছেঁড়া গামছাখানা পাতা আছে,—দৃষ্টি ওরি ওপর,— যে যা দিয়ে যায়। কোনো দিন একটা কুলও পড়ে, তাই দিয়েই এই বিপুল belly (পেটটা) ঠাণ্ডা করতে হয়। এখন বলি কি—ছাড়লে কেনো,—আবার চড়িয়ে ফ্যালো। হ্যাঁ—কি পুঁজি নে বেরিয়েছ? হাত দেখার হুজুর?"

"আজ্ঞে না!"

"ওকি কথা! দেবতাদের 'না' বলতে নেই। বোলো —'নারায়ণ জানেন'। এখানে আমার মস্ত নাম— প্রেতানন্দ। বোসো, তোমাকে হাতটা দেখাই,—এই সময় মেয়েরাও নাইতে এসেছে—ওরাই আমাদের সেভিং-ব্যাঙ্ক। আমি হাত দেখাচ্ছি দেখলে—সবাই ভেঙে

পড়বে,—কিন্তু আধা-আধী! বলবো—লোকে বড় জ্বালাতন করে; সাধনার ক্ষতি হয়,—তাই প্রচ্ছন্ন থাকেন। চেহারায় চমক আছে,—বসে যাও। ভক্তের দেশ—সেধে হালুয়া-পুরি খাওয়াবে। তিন বচরে—লাক্‌চাঁদ! বুঝলে,—চেপে বস দিকি। ভালো কথা,—জোড়ে না বিজোড়ে?"

"একলাই বেঁরিয়েছি।"

"এমন ভুলও করে! ধর্ম্মমাচরেৎ যে হে! মওকা যেলেনি বুঝি? উঁচিয়ে আছ! রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ নাকি! তাই ত,—স্কলারদের যে আরো নিভৃত-নিবাস দরকার,—এ তীর্থরাজ কাজ দেবে না,—উত্তরা-খণ্ডই উত্তম। আমরা গ্রাজুয়েট্—মাঝামাঝিতেই চলে যায়। আচ্ছা—তবে সরে পড়ো!"

আমি তাঁর হাতে ছুটি টাকা দিলুম।

মুখের দিকে চেয়ে বললেন—"জলে ফেললে যাদু! তবে—আজ একমুঠো ভাত খেয়ে বাঁচবো। পয়সা রেখো,—কোনো ব্যাটা পুছবে না। আর কি দাতাকর্ণের মত' মুক্ষু জন্মায় যে তোমার বরাতে ছেলের মাথায় করাত বসাবে! হ্যাঁ—ও রয়েল্-ড্রেসটা যদি না রাখো—(রাখলেই ভালো হয়)—তো আমাকেই দিয়ে যাও বাবা।"

গেরুয়াগুলো তাঁকেই দিলুম।

বললেন—"তাই তো বাবা—যাবে? কি জানি প্রাণটা যে কেমন করে! ভাল বেসে ফেললুম নাকি,—মনে যে দাগ কাটে! ধরা না পড়ো তো বেঁচে থাকো। তাই তো,—ভালবাসলুম আর চললে!"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উদাস ভাবে বললেন—"আমার আর আপনার কেউ রইল না!"

এমন দরদের কথাটা আমাকে কোনোদিন কেউ শোনায়নি! আজ প্রেতানন্দের কাছে পেলুম। মাথা আপনি নুয়ে প্রণাম করলে।

ধরা-গলায় ভিজে আওয়াজে বললেন—"পাষণ্ডের প্রার্থনা সেথায় পৌছয় কিনা জানিনা,—আমি কিন্তু ছাড়ব না,—তোমাকে তিনি রক্ষা করুন। এদিকে এলে—একবার দেখা দিও বাবা।" চোখ মুছলেন।

স্বীকার করে,—এক বুক ব্যথা নিয়ে বেরুলুম। রাস্তায় উঠে—নিজের চোখের জল সামলাতে পারি না!

জগতে এই একটি আপনজন আমার মিলেছিল। সে মুহূর্ত্তে তিনি তাঁর সমস্ত অতীতকে উত্তীর্ণ হয়ে সত্যিকার মানুষে প্রতিষ্ঠিত।

মনটা মিইয়ে গেল'। জীবনে সত্যিকার স্নেহের ডাক কি দুর্লভ জিনিস! যেতে পা উঠছিল না। ভাবলুম—দেশেই ফিরি,—কিন্তু কার কাছে!

দূর করো,—দিল্লী-লাহোরটাই দেখা যাক।

(ড্রন্;—একষ্ট্রা ১০ মিনিট)

ওগো দরদিয়া—

শ্রী জীবনানন্দ দাশগুপ্ত

—ওগো দরদিয়া,

তোমারে ভুলিবে সবে,—যাবে সবে তোমারে ত্যজিয়া ;
ধরণীর পসরায় তোমারে পাবে না কেহ দিনান্তেও খুঁজে',
কে জানে রহিবে কোথা নিশি ভোর নেশাখোর আঁখি তব বুজে' ।
—হয় তো সিন্ধুর পারে শ্বেতশঙ্খ ঝিনুকের পাশে
তোমার কঙ্কালখানা শুয়ে রবে নিদ্রাহারা উর্ম্মির নিঃশ্বাসে ।
চেয়ে রবে নিষ্পলক অতিদূর লহরীর পানে,
গীতিহারা প্রাণ তব হয়তো বা তৃপ্তি পাবে তরঙ্গের গানে ।
হয়তো বা বনচ্ছায়ে লতাগুল্ম পল্লবের তলে
ঘুমায়ে রহিবে তুমি নীলশষ্পে শিশিরের দলে ;
হয়তো বা প্রান্তরের পারে তুমি র'বে শুয়ে প্রতিধ্বনিহারা,—
তোমারে হেরিবে শুধু হিমানীর শীর্ণাকাশ,—নীহারিকা,—তারা,
তোমারে চিনিবে শুধু প্রেত-জ্যোৎস্না,—বধির জোনাকী ।
তোমারে চিনিবে শুধু আঁধারের আলেয়ার আঁখি !
তোমারে চিনিবে শুধু আকাশের কালো মেঘ,—মৌন,—আলোহারা,
তোমারে চিনিয়া নেবে তমিস্রার তরঙ্গের ধারা ।
কিম্বা কেহ চিনিবে না,—হয়তো বা জানিবে না কেহ
কোথায় লুটায়ে আছে হেমন্তের দিবাশেষে ঘুমন্তের দেহ
—হ'য়েছিল পরিচয় ধরণীর পান্থশালে যাহাদের সনে,
তোমার বিষাদহর্ষ গেঁথেছিলে একদিন যাহাদের মনে
যাহাদের বাতায়নে একদিন গিয়েছিলে পথিক-অতিথি
তোমারে ভুলিবে তারা,—ভুলে যাবে সব কথা,—সবটুকু স্মৃতি ।
নাম তব মুছে যাবে মুসাফের,—অঙ্গারের পাণ্ডুলিপিখানি
নোনাধরা দেয়ালের বুক থেকে খ'সে যাবে কখন না জানি ।

তোমার পানের পাত্রে নিঃশেষে শুকায়ে যাবে শেষের তলানি,
দণ্ড দুই মাছিগুলো করে যাবে মিছে কাণাকাণি।
তারপর উড়ে যাবে দূরে দূরে জীবনের সুরার উল্লাসে,
মৃত এক অলি শুধু পড়ে রবে মাতালের বিছানার পাশে।
পেয়ালা উপুর করে হয়তো বা রেখে যাবে কোনো একজন,
কোথা গেছে ইয়োসোফ্ জানেনা সে,—জানেনা সে গিয়েছে কখন।
জানেনা যে,—অজানা সে,—আরবার দাবী নিয়ে আসিবে না ফিরে',—
জানেনারে চাপা পড়ে গেছে সে যে কবেকার কোথাকার ভিড়ে!
—জানিতে চাহে না কিছু,—ঘাড় নীচু ক'রে কেবা রাখে আঁখি বুজে'
অতীত স্মৃতির ধ্যানে অন্ধকার গৃহকোণে একখানা শূন্যপাত্র খুঁজে'।
—যৌবনের কোন এক নিশীথে সে কবে
তুমি যে আসিয়াছিলে বনরাণী।—জীবনের বাসন্তী-উৎসবে
তুমি যে ঢালিয়াছিলে ফাগরাগ,—আপনার হাতে মোর সুরাপাত্রখানি
তুমি যে ভরিয়াছিলে,—জুড়ায়েছে আজ তার ঝাঁঝ,—
ফুরালো তলানি।
তবু তুমি আসিলে না,—বারেকের তরে দেখা দিলে নাক' হায়।
চুপে চুপে কবে আমি বসুধার বুক থেকে নিয়েছি বিদায়—
তুমি তাহা জানিলে না,—চলে গেছে মুসাফের,
কবে ফের দেখা হবে আহা
কেবা জানে। কবরের পরে তার পাতা ঝরে,—হাওয়া কাঁদে হা হা।

সাহিত্য

শ্রী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সে কোন্ এক আদিম যুগের কথা। মানুষ তখন সবে মাত্র পৃথিবীকে দেখতে সুরু করেছে। জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রকৃতির রহস্য বোঝবার ক্ষমতা তখন তার হয় নি। রসের দিক থেকেও তার মন তখন পরিপূর্ণতা লাভ করে নি। মানুষের মনের তখন শিশু-অবস্থা। প্রকৃতির মধ্যে

যা কিছু সে দেখে তাই তার বিস্ময় জাগায়, ভয় জাগায়। ভীতি ও বিস্ময়ে সে অভিভূত হয়ে পড়ে, তাকে স্তব করতে সুরু করে, তাকে পূজো করে তাকে দেবতা বানিয়ে নিজেদের সেই দেবতার গোত্রজ বলে স্থির করে সোয়াস্তি লাভ করে।

মানুষের প্রথমসৃষ্ট বাণী এই পরম বিস্ময় ও পরম ভয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তার সেই সীমার বাইরে, তার ক্ষমতার বাইরে সে যা কিছু মহান্ তেজোময় বস্তু দেখেছে তাকেই সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে স্তব করেছে। এই পরম বিস্ময় ও ভয়ের উপর নির্ভর করে এপিক্ সাহিত্য গড়ে উঠেছে। সূর্য্য, চন্দ্র, বরুণ, ইন্দ্র, জুপিটার, মার্কারি ইত্যাদি নামে প্রকৃতির সমস্ত শক্তির নামকরণ করে মানুষ তাদের সঙ্গে মিতালি করেছে। কিন্তু তাহলেও এই মিতালির মধ্যে কেমন যেন একটা স্বার্থের ও ভয়ের গন্ধ আছে। কি জানি দেবতারা রেগে উঠে যদি কিছু করে বসেন তাঁদের সন্তুষ্ট রাখাই মঙ্গল এই অসহায় মনোভাব থেকেই মিতালির উৎপত্তি।

এপিক্ সাহিত্য তাই স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালকে এক রসায়নে জারিয়ে নিয়ে এক রসের সৃষ্টি করেছে। তখন মানুষের জীবন খুবই স্বচ্ছ ছিল। তার জীবনের পরিধিও খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে সংঘাত করে তার হাত থেকে অনেক কিছু ছিনিয়ে নেবার মত বুদ্ধি ও ক্ষমতা তখন তার ছিল না। অভাবও ছিল তার অল্প, তাই সে অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকত। তখন মারামারি কাড়াকাড়ি করার জিনিস ছিল গোধন। আর তাই নিয়ে মধ্যে মধ্যে এ-রাজায় সে-রাজায় বিবাদ হ'ত, আবার সব শান্ত হ'য়ে যেত,—জীবন বয়ে যেত একটানা পাহাড়ে নদীর মত।

তাই এপিক্ সাহিত্য সেই যুগের সমস্ত লোকের সমষ্টিবদ্ধ জীবনযাত্রার অতি সুন্দর অতি সহজ অতি বিস্তৃত ইতিহাস। ব্যক্তির কথা তাতে নেই। ব্যক্তি তখনও স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নি। সমষ্টির অঙ্গীভূত বলে তার যতটুকু মূল্য তার বেশী তার আর কিছুই প্রাপ্য ছিল না। তখন জীবনে জীবনে দ্বন্দ্ব জেগে ওঠেনি, তাই ব্যক্তিও সে সময় সমষ্টিগত ছিল।

তাই রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, প্রভৃতি এপিক্ গুলি পড়লে সব কটির মধ্যে থেকে এই একটি কথাই আমাদের চোখে পড়ে যে মানুষের শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নয় প্রকৃতির এমন-সব ক্ষমতাকে মানুষ এক দিকে দেবতা করে তুলেছে, অন্যদিকে আবার সেই দেবতাকে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত করে ব্যবধান ঘুচিয়ে নেবার প্রয়াস পেয়েছে। সেখানে জীবনে সংঘাত নেই, অনুভূতিও নেই। নিছক্ বাইরের কথা, সদরের কথা নিয়ে এপিক্ তৈরী হয়েছে। ভিতরের কথা অন্তরের মণি-কুঠরীর খবর এপিকে একেবারেই নেই।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এপিক্ যে আমাদের ভালো লাগে সে কথা তো কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি নে। কেন ভালো লাগে, এপিকের মধ্যে কি এমন বস্তু আছে যা তাকে সাহিত্য করে তুলেছে সে কথাটা ভেবে দেখা আবশ্যক।

এই বহির্জগৎ সম্বন্ধে মানুষের চিরকালই একটা মহান্ বিস্ময় আছে। স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষের মনে এই বিস্ময় বাসা বেঁধে আছে। বৈজ্ঞানিকেরা এই বহির্জগতের রহস্যময় প্রকৃতির অবগুণ্ঠন সরিয়ে তার স্বরূপ অনেকটা সকলের কাছে সুলভ করে দিয়েছেন সত্যি, কিন্তু রসের দিক থেকে তো সেই তথ্য জেনে কিছুমাত্র তৃপ্তি নেই তাঁদের। ফুলকে তাঁরা টুক্‌রো টুক্‌রো করে তার পাপড়ি ছিঁড়ে তার কোরক এনে ফুলের জাতিতত্ত্ব বিষয়ে অনেক গবেষণা করতে পারেন, কিন্তু রস-পিপাসু হৃদয়ের কাছে ফুল যে চিরকালের বিস্ময়, ফুলের বুকের মধ্যে তার মন যে প্রজাপতির মত অহরহ বসতি করে আছে সৃষ্টির রহস্যের মাধুর্য্যে অবশ হয়ে!

বহির্জগৎ সম্বন্ধে এই যে শিশু-সুলভ অসীম বিস্ময় মানুষের মধ্যে আছে, তারই পরিণতি হয়েছে এপিক সাহিত্যে। আকাশ, বাতাস, জল, স্থলকে তখন যে পরমাশ্চর্য্য বিস্ময়ের সঙ্গে মানুষ দেখেছিল সেই বিস্ময়ের অনেক-